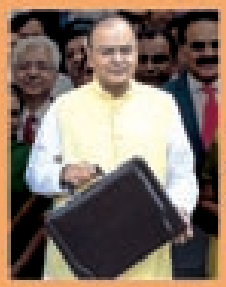

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কেন্দ্রীয় বাজেট :
নতুন আশা ও
কিছু প্রশ্ন

—পৃঃ ১৪

অনৈতিক
সিদ্ধান্তের
কড়া মূল্য
চোকালেন
স্বরাষ্ট্রসচিব
অনিল গোস্বামী

—পৃঃ ২৭

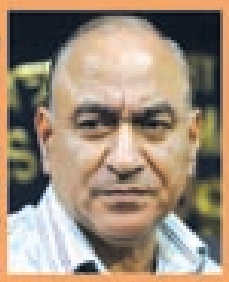

৬৭ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা || ১৬ মার্চ ২০১৫ || ১ চৈত্র - ১৪২১ || website : www.eswastika.com

বাজেট

২০১৫

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১ চৈত্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৬ মার্চ - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

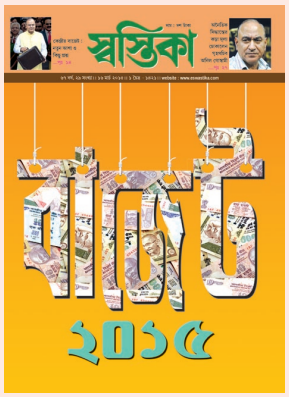

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : সিপিএমে নতুন মুখ— সাদা রঙের বুদ্ধ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

মমতাকে সবক শেখানোই মুকুলের লক্ষ্য ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সংবিধানের 'সেকুলার' ও 'সোস্যালিস্ট' শব্দ দুটি নিয়ে বিতর্ক হোক ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১১

কেন্দ্রীয় বাজেট : নতুন আশা ও কিছু প্রশ্ন ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৪

বিজেপি সরকারের ঘোষিত নীতি ও কেন্দ্রীয় বাজেট ▯ এন সি দে ▯ ১৬

শক্তিপীঠ দেবী বোদেশ্বরী ▯ দেবব্রত চাকী ▯ ২১

পরিবর্তিত জমানায় অনৈতিক সিদ্ধান্তের কড়া মূল্য চোকালেন গৃহসচিব অনিল গোস্বামী ▯ আর কে রাঘবন ▯ ২৭

কেন্দ্রীয় বাজেট : বৃহৎ লক্ষ্যের সূচনা ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ২৯

সীমান্তে ছড়ানো হচ্ছে উত্তেজনার পারদ ▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩১

বালী কি স্বাধীন হিন্দু দ্বীপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে? ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য : ৩৫-৩৬ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

স্বস্তিকা

২৩ মার্চ, ২০১৫, বিশেষ সংখ্যা

ডা: হেডগেওয়ার ও বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন

সারা দেশ জুড়ে আজ জীবনের সব ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ভাবনাকে দেশব্যাপী সর্বস্পর্শী করার ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণে আসে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার— সংক্ষেপে ডাক্তারজী। এই বছর তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষ। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা-চিন্তার আজ কতটা প্রতিফলন ঘটেছে— এই বিষয় নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে স্বস্তিকা-র আগামী২৩ মার্চের বিশেষ সংখ্যাটি।

লিখছেন--- কেশবরাও দীক্ষিত, ড. মনমোহন বৈদ্য, রমেশ পতঙ্গে, সত্যনারায়ণ মজুমদার, বিদ্রোহী সরকার, ডাঃ সনৎ বসুমল্লিক, ড. জিষ্ণু বসু প্রমুখ।

সম্পূর্ণ রঙিন। মূল্য ১৫ টাকা। সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

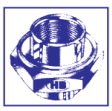

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

আইনজীবীদের কর্মবিমুখতা

ভারতে বিচার প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলিয়া থাকে। কিন্তু কলকাতা উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে এই ধীর গতির দায়িত্ব বিচারপতিদের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। হোলির দিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর অন্য বিচারপতিদের সহিত আদালতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ৮৫ শতাংশ আইনজীবী উপস্থিত হন নাই। যদিও প্রধান বিচারপতি হোলির দিন ছুটির প্রস্তাব খারিজ করিলেও বার অ্যাসোসিয়েশনে জানাইয়া দেন, অন্য একটি ছুটির কাজ করিয়া পুষাইয়া দিলে হোলির ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন। সেই প্রস্তাবে বার অ্যাসোসিয়েশন রাজি হয় নাই এবং পরেও যে ছুটির সহিত আপস করিয়া তাঁহারা কাজ করিবেন না তাহা প্রধান বিচারপতিকে জানাইয়া দেন। আইনজীবীদের এই দাবির পক্ষে বলা যাইতেই পারে, সমগ্র রাজ্যে যাহা চলিতেছে খামোকা উচ্চ আদালতের আইনজীবীরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? তাই বিচারপতিরা আসিলেও তাঁহারা আদালতে আসিলেন না। কারণ তাঁহাদের দোলেও ছুটি, আবার হোলিতেও ছুটি। গত বছর হইতে রাজ্য সরকার দোল ও হোলি দুই দিনই ছুটি ঘোষণা করিয়াছে। অবশ্য কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যসরকারের অধীনে নয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, রাজ্যের আইনজীবীরা নাকি রাজ্য সরকারের অনুগামী। তাই প্রধান বিচারপতির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা কর্মবিমুখ রহিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বছরে ২১০ দিন হাইকোর্ট খোলা রাখিতেই হইবে। সেই ভাবেই প্রস্তুত হয় হাইকোর্টের ক্যালেন্ডার। তাই হাইকোর্টের ছুটির সহিত রাজ্য সরকারের ছুটির দিনের পার্থক্য থাকিয়া যায়। আর বিরোধ এইখানেই। এই বিরোধের কারণে বিচারপ্রার্থীরা হয়রানির স্বীকার হইতেছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে আদালত চালাইবার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন তাহার ফলে এক উদ্বেগজনক চিত্র—অনুশাসন ও দায়বদ্ধতার, কর্মসংস্কৃতি ও বিচারপ্রার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই স্পষ্ট হইয়া ইঠিয়াছে।

শ্রীরামপুর আদালতেও সম্প্রতি আইনজীবীরা একটি এজলাসের কাজ টানা ৫০ দিন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইখানেও চরম ভোগান্তি হইয়াছে বিচারপ্রার্থীদের। কিন্তু তাঁহাদের কিছু করিবার উপায় নাই। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন, 'বিচারপ্রার্থীদের ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনারা কী পান? মক্কেলরাই তো আপনাদের ভগবান। তাঁহারাই তো আপনাদের রুজিরুটি।' সবই সত্য, কিন্তু আদালত হইল সেই স্থান যেখানে এই বাক্য মূল্যহীন। হাইকোর্টে মামলার বোঝা দিনে দিনে বাড়িতেছে। হিসাব বলিতেছে, অরিজিনাল সাইডে জানুয়ারিতে নিষ্পত্তি হইয়াছে ১১৪৫ মামলার এবং বকেয়া রহিয়াছে ২১৫৯০টি মামলা। অ্যাপেলেট সাইডে জানুয়ারিতে নিষ্পত্তি ৬ হাজার ৭৪৯টি এবং বকেয়া ২,৫৬, ৯১২টি। বিচারপ্রার্থীরা দিনের পর দিন বিচারের আশায় আদালতে ধরনা দিতেছেন এবং দিনের শেষে হতাশায় বাড়ি ফিরিতেছেন। ইহার পরেও আইন আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা রহিয়াছে—যাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। বস্তুত বিচারপ্রার্থীদের জন্যই যখন আদালত, বিচারপতি, আইনজীবী এবং আদালত কর্মীদের এত রমরমা তখন তাঁহাদের প্রতি সকলের এতো অবহেলা অবজ্ঞা কেন? দিনের পর দিন এই অবজ্ঞা অবহেলা চলিতেছে। সরকার পরিবর্তন হইলেও বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা আসে নাই। মন্দিরের পাণ্ডাদের দাপটে ভক্তেরা যেমন অসহায়, আদালতে আইনজীবীদের দাপটেও বিচারপ্রার্থীরা তেমনই অসহায়। সমাজে উন্নয়নের সহিত বহু বিভাগের নানা উন্নয়ন হইয়াছে, কিন্তু বিচার বিভাগে কর্মসংস্কৃতির উন্নয়ন কতটুকু হইয়াছে তাহা বলা কষ্টকর। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। আজ আইনজীবীর সওয়াল ছাড়াই কোনোভাবে মামলার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে কিনা সেই প্রশ্নও উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে প্রয়োজন সাহসী সিদ্ধান্ত। আজ সময় আসিয়াছে সেই সাহসী সিদ্ধান্ত লইবার। এক পক্ষের খামখেয়ালিপনায় বিচারপ্রার্থীরা চিরকাল বঞ্চিত হইবেন এই তামাশা বেশিদিন চলিতে পারে না। আর চলিতে দিলে বিচারব্যবস্থাটিই তামাশায় পরিণত হইয়া পড়িবে। বিচারপ্রার্থীদের জন্যই যখন এত কিছুর আয়োজন তখন তাঁহাদের স্বার্থই সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। ইহারই সহিত সমস্ত বিচারপ্রার্থীর নিজের বক্তব্য সরাসরি পেশ করিবার আইনত ক্ষমতা দিতে হইবে। কেবল তাহা হইলে এই সমস্যার কিছুটা হইলেও সমাধান হইতে পারে।

সুভাষিতম্

অলসস্য কুতো বিদ্যা অবিদ্যস্য কুতো ধনম্।
অধনস্য কুতো মিত্রম্ অমিত্রস্য কুতো সুখম্।।
অলসের বিদ্যা কোথায়? বিদ্যাহীনের ধন কোথায়? নির্ধনের মিত্র কোথায়? যার মিত্র নেই তার সুখ কোথায়?

৩০টি এনজিও-র বিদেশি অর্থ আসা নিষিদ্ধ করল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের নাম ভাঙিয়ে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩০টি এন জি ও-কে নিষিদ্ধ করল। এই এন জি ওগুলির সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স এজেন্সির আপত্তিজনক রিপোর্ট পেয়েই সরকার এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইগুলি আগের সেই ৬৯টির মধ্যে, যেগুলিকে সরকার বিদেশি অর্থ ফান্ডিংয়ের জন্য ফরেন কনট্রিবিউশন অ্যাক্ট (এফ সি আর এ)-এর থেকে রিপোর্ট পেয়ে আগেই সতর্ক করেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের তালিকায় থাকা বেশিরভাগ সন্দেহজনক এনজিওগুলি তামিলনাড়ু ও গুজরাটকে তাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এগুলির মধ্যে ১৪টিকে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার কালো তালিকাভুক্ত করেছে। সংখ্যালঘুদের লোকদেখানো উন্নতির জন্য ৮টি এনজিও খাতাকলমে ছিল। তার মধ্যে ৭টি খৃস্টান ও ১টি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য দেখানো হচ্ছিল। আবার তামিলনাড়ুতে ১২টি এনজিও-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গুজরাটে ৪টি খৃস্টান ও ১টি মুসলমান সম্প্রদায় পরিচালিত এনজিও নিষিদ্ধ হয়েছে। সংস্থাটি মুসলমানদের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত দেখিয়েছিল। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজ্জু গত ৪ মার্চ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, 'সারা দেশে ১৫টি সংস্থাকে কেন্দ্র সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে যারা খৃষ্টান ও মুসলমানদের সেবার অজুহাতে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো।

বিদেশ থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ পাওয়া এনজিওগুলির গতিবিধি ও হিসাবপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যারা উপযুক্তভাবে তাদের রিটার্ন দাখিল করতে পারেনি তাদের আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যারা এফসিআরএ-র নিয়মকানুন না মেনে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করত সেগুলিকে দেশের স্বার্থের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এরকমও জানিয়েছেন কিরেন রিজ্জু। রিজ্জু সংসদকে জানিয়েছেন, তুতিকোরিন ডাইওসিসান অ্যাসোসিয়েশন, ইস্ট কোস্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট, তুতুকুড়ি সেন্টার ফর প্রমোশন অ্যান্ড সোশ্যাল কনসার্নস্, মাদুরাই এবং গ্রিনপিচ ইন্ডিয়া সোসাইটি, চেন্নাই-এর মতো এনজিও-র বিরুদ্ধেও ইনন্টেলিজেন্স এজেন্সির থেকে আপত্তিজনক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সুখের বিষয়, নরেন্দ্র মোদী সরকার এনজিওগুলির বিদেশি চাঁদার ব্যাপারে যাচাই করতে তৎপর রয়েছেন।

তহবিল তছরূপের অভিযোগ

তিস্তার সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় বিতর্কিত সমাজসেবী তিস্তা শীতলাবাদের এনজিও সবরং ট্রাস্টকে দেওয়া জনসাধারণের টাকা তছরূপের অভিযোগে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়লো কেন্দ্রীয় মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। এই বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটিতে তিস্তার সঙ্গে তার স্বামী জাভেদ আনন্দও যুক্ত রয়েছেন। তিস্তার বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। গত মাসেই সুপ্রিম কোর্টে জোড়া অনুমানমূলক জামিন পেয়েছেন তিস্তা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ২০০২-এ গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় গুলবার্গ সোসাইটি কাণ্ডে মিউজিয়াম নির্মাণের কথা বলে দেড় কোটি অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে ওই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গুজরাটে সরকার-বিরোধী যে নানা পদক্ষেপ করেছিলেন তিস্তা, তাতে তার অসদুদ্দেশ্য ইদানীং নানা ঘটনায় প্রকাশ্যে আসছে।

সরকারি সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এই কমিটির যে সদস্যদের নাম অনুমোদন করেছেন তাঁরা হলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, যিনি এর শীর্ষে থাকছেন। বাকি দু'জন গুজরাটের গান্ধীনগরস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ এ বারি এবং মন্ত্রকের একজন নির্দেশক গয়া প্রসাদ। সূত্রের এও খবর, শীতলাবাদের প্রাক্তন সহযোগী আমেদাবাদের রইস খান পাঠানের অভিযোগের ভিত্তিতে তিস্তা ও আনন্দের বিরুদ্ধে তদন্তে এগোয় কেন্দ্র।

একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক তথ্যের অধিকার আইনে পৃথক আবেদন মারফত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে জেনেছে যে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে ভারত সরকারের 'ফ্ল্যাগশিপ' কর্মসূচি সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় সবরং ট্রাস্ট তার মুম্বইয়ের 'খোঁজ' প্রকল্পের জন্য মন্ত্রক থেকে গত তিন বছরে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা নিয়েছে। গত বছরের ১২ জুন 'অব্যয়িত হিসাব' দেখিয়ে ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭১ টাকা ফেরত পাঠিয়েছে তারা। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিভাগের অধীনস্থ এই সর্বশিক্ষা অভিযানে ইউপিএ আমলে তিস্তা-র সংস্থা ছাড়াও বিনায়ক সেন, কিরণ বেদী ও আমোদ খানের সংস্থাও সরকারি অনুদান লাভ করে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, গত জমানায় প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সরকারি আনুকূল্যের সুবাদে তহবিল তছরূপ করে জমানা বদলে কঠিন ঠাঁই বুঝে সামান্য কিছু অর্থ 'অব্যয়িত' দেখিয়ে চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন তিস্তা শীতলাবাদ।

উত্তর-পূর্বে পাকিস্তানের মদতে ইসলামিক হোমল্যান্ডের চক্রান্ত

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ পাকিস্তানি গুপ্তচর আই এস আইয়ের মদতে ভারত ও বাংলাদেশের কট্টর মৌলবাদীরা বেশ কটি মুসলমান সংগঠনকে টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে চলেছে। শুধু অসমেই ৩৮টি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের মধ্যে ১৩টি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। এদের কার্যকলাপ বিচ্ছিন্নতাবাদী, হিন্দু-বিদ্বেষী ও ভারত-বিরোধী। অসমে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ গড়াই এই সব সংগঠনের উদ্দেশ্য বলে জানা গেছে। অসম, ত্রিপুরা ও মণিপুর নিয়ে এরা পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের তৎপর বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদও এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করেছে। অন্যদিকে, মণিপুরে উগ্রপন্থী তৎপরতা এখন তুঙ্গে, সেখানে ৪৩টি জঙ্গি সংগঠনের শরিক বেশ ক'টি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। এরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্র চাইছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনীর এক গোপন প্রতিবেদনে উত্তর-পূর্ব ইসলামিক হোমল্যান্ডের গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আওয়ামি লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর উত্তর-পূর্বের জঙ্গিরা প্রমাদ গুনতে শুরু করে। হাসিনা সরকারের জঙ্গিমুক্ত করা অভিযান শুরু হতে আলফা, এন ডি এফ বি, এন এল এফ টি, কে এল ও-র মতো অনেক জঙ্গি মায়ানমারে আশ্রয় নিয়েছে। কে এল ও প্রধান জীবন সিংহও বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিছু জঙ্গি অসমের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বৃহত্তর নগাঁও, বরাক উপত্যকায় গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামিক কট্টরপন্থীদের বেশ কিছু ব্যক্তি অসমে লুকিয়ে রয়েছে। ২০১৪ জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরেন শেখ হাসিনা। পাকিস্তানপন্থীরা বাংলাদেশে নৈরাজ্য ও হিংসা চালাচ্ছে। এদের লক্ষ্য বাংলাদেশে সামরিক শাসন ডেকে আনা, যা হবে ভারত বিরোধী। অসম রাজ্য গোয়েন্দাদের শাখা, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই বি এদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও প্রশাসনের হাতে অনেক আগেই তুলে দিয়েছে। অসমে যে সব মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন যারা বাংলাদেশের মৌলবাদীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী ছিল। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও তারা মৌলবাদীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর এন আই এর তদন্তে পশ্চিমবঙ্গেও পাকিস্তানপন্থী জঙ্গিদের অস্তিত্ব সামনে উঠে এসেছে। যে সংগঠনগুলি অসমে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্যে কাজ করেছে তারা হলো, মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম (মুলফা), হরকতুলে মুজাহিদিন, মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (মুলফা), মুসলিম লিবারেশন আর্মি ইন্ডিপেনডেন্ট লিবারেশন আর্মি অফ অসম, ইসলামিক সিকিউরিটি ফোর্স অব ইন্ডিয়া, লিবারেশান ইসলামিক টাইগার ফোর্স অফ ইন্ডিয়া। জামাতে ইসলামি, ইউনাইটেড সোস্যাল রিফর্ম আর্মি, ইসলামিক সেবা সঙ্ঘ, ইউনাইটেড রিফর্ম প্রোটেস্ট অব অসম, সিমি, পিপলস ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট, স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন, ইসলামিক লিবারেশন আর্মি প্রভৃতি। এদের সামগ্রিক লক্ষ্য অসমকে প্রথমে মুসলমান রাজ্যে পরিণত করা। পরে ইসলামিক হোমল্যান্ডের দাবি তোলা। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে সিমি, হরকাতুল জেহাদ, জে এম বি সহ একাধিক সংগঠন গোপনে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্রের গোপন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে আই এস আই-এর মদতে। এন আই এস বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তে নেমে বহু বিস্ফোরক তথ্য ও আই এস আই-এর ভারত বিরোধী পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছে।

অসমে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে আটক কেপিএলটি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে আটক হয়েছে কার্বি পিপল'স লিবারেশন টাইগার (কেপিএলটি) নামক নিষিদ্ধ সংগঠনটির প্রায় সব শীর্ষ নেতাই। অসম ভেঙে স্বশাসিত কার্বি রাজ্যের দাবিতে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের হাতে বিগত বছরগুলিতে বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান। সেনার রেড হর্ন বিভাগ ও অসম পুলিশের যৌথ অভিযানে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে অসমের কার্বি আলং জেলা থেকে কেপিএলটি-র পনেরো শীর্ষনেতা গ্রেপ্তার হয়। নিরাপত্তারক্ষীরা কার্বি টাইগারদের স্বঘোষিত চেয়ারম্যান জিংহানসে ওরফে ডোনড্রি ক্রামসা, কম্যান্ডার ইন চীফ সুন্দর ডেরা, ডেপুটি কম্যান্ডার ইন চীফ ডেনজার ইঙ্গটি, অর্থ সচিব বিরটন তিমাঙ ওরফে রক, অডিটর হিমাই সিং ক্রো-সহ অন্য নেতাদের অসমের ওই পার্বত্য জেলার বিভিন্ন লুকোনো স্থান থেকে গ্রেপ্তার করে। নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, এ কে রাইফেল সমূহ, পিস্তল, গ্রেনেড, হাজার রাউন্ড বুলেট ইত্যাদি উদ্ধার করতেও সক্ষম হয় তারা। প্রসঙ্গত, ২০১১-এর গোড়ায় জানুয়ারিতে আলোচনা বিরোধী কার্বি লঙরি নর্থ কাছাড় হিলস লিবারেশন ফ্রন্ট থেকে ২৫ জন ক্যাডার নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয় কেপিএলটি। পরবর্তীকালে এদের ক্যাডার সংখ্যা একশোয় গিয়ে পৌঁছোয়। ৬০ জন কেপিএলটি জঙ্গি নাগাল্যান্ড-বর্মা সীমান্তে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে। নিরাপত্তাবাহিনী এই ঘটনাকে উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি-বিরোধী অভিযানে আজ অবধি সবচেয়ে বড়ো সাফল্য বলে ঘোষণা করেছে। গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর অসমে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব্ বড়োল্যান্ড (আই কে সংবিজিত গোষ্ঠী) জনজাতিদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়ে ৭০ জনকে হত্যা করার পরই বেআইনি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির ওপর অভিযান জোরদার করা হয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে হিংসা ছড়ানো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কথাবার্তায় গিয়ে তাদের আর কোনো প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

মালদায় চিঠি দিয়ে ডাকাতির হুমকি, উদাসীন পুলিশ, আতঙ্কিত মানুষ

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার মানিকচক এবং ইংলিশ বাজার ব্লকের কিছু গ্রামে চিঠি দিয়ে ডাকাতির ঘটনায় গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। গত ১ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত ইংলিশ বাজারের মাদিয়া এবং মানিকচকের নিয়ামত পুর থেকে ডাকাত সন্দেহে যাদের ধরা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। গত এক সপ্তাহ ধরে দু'টি ব্লক ছাড়াও রতুয়া ব্লকেও উড়ো চিঠিকে কেন্দ্র করে ডাকাতির তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ দু'টি জায়গাতে ক্যাম্প করলেও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে আতঙ্ক কাটেনি। গ্রামের মানুষ পুলিশের ওপর ভরসা হারিয়ে নিজেরাই রাতপাহারায় নেমেছেন। এর মধ্যেই আতঙ্ক ছাড়ানো মালদার গ্রামগুলিতে টহলদারিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। গভীর রাতে ইংরেজবাজার থানার নিয়ামতপুরে সাধারণ পোশাকে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে চিনতে না পেরে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রামবাসীরা ঢিল ছোঁড়ে। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে ১৪ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে। ধরমপুর, শোভানগর, মানিকচক, রতুয়াতে উড়ো চিঠি ও লোকমুখে ডাকাতির আতঙ্ক ছড়ানোর পাশাপাশি পর পর কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শোভানগরে বোমাবাজি হয়। এক বহিরাগতকে তাড়া করে স্থানীয়রা তার বাইকটি জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ অস্ত্র-সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যেই পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে গ্রামে গ্রামে রাতপাহারা শুরু হয়ে যায়। অচেনা মানুষ এলাকায় ঢুকলেই তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসাবাদ, এমনকী মারধোরের ঘটনাও ঘটছে। রতুয়ার পেট্রলপাম্পে ডাকাতি হয়। মানিকচকে একটি স্কুলে টাকা চেয়ে হুমকির পোস্টার পড়ে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার টাকা না দিলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া চিঠি স্কুলের দেওয়ালে সাঁটা অবস্থায় দেখা যায়। ফলে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে দিচ্ছেন না। পুলিশ প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে গ্রামবাসীরা নিজেরাই লাঠি, বল্লম নিয়ে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিচ্ছে। অতীতে এক সময়ে রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাতরা যেভাবে চিঠি দিয়ে বাড়িতে ডাকাতি করতো বর্তমানে সেই ভাবেই পুলিশকে এবং গ্রামবাসীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডাকাতি করার ঘটনায় সকলে হতবাক হয়েছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, সংখ্যালঘু তোষণ এবং সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দলতন্ত্র কায়েম করতে এইভাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন। বিশেষ করে হিন্দু গ্রামগুলিতেই এই ডাকাতির ঘটনা বেশি হওয়াতে সন্দেহের তির প্রশাসনের দিকে। তাদের উদাসীনতায় সন্দেহ বাড়ছে। ডাকাতির আতঙ্কে মাদিয়াঘাট গ্রামের বাসিন্দারা ১ মার্চ পাহারা দেওয়ার সময় অস্ত্র-সহ নবিউল ইসলাম, আসাদুল শেখ ও সাদিকুল ইসলামকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরও পুলিশ ডাকাতির উড়ো চিঠির সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে এড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে একের পর এক বোমাবাজি, ডাকাতি এবং চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। মানিকচকে এক পুলিশকর্মীর বাড়িতেই ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। ভুল করে গ্রামবাসীরা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের গাড়িকে আক্রমণের ঘটনায় গ্রামবাসীদের যেভাবে পুলিশ হেনস্থা করেছে, তাণ্ডব চালিয়েছে এবং মহিলাদের গায়ে হাত দিয়েছে তাতে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানাবে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে স্থানীয় মানুষ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছে।

মহারাষ্ট্রে গোহত্যা নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগেই গোহত্যা বন্ধ আইন পাশ হয়েছে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডে। এবার মহারাষ্ট্রেও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হলো গোহত্যা ও গোমাংস কেনাবেচা। মহারাষ্ট্রের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে ফড়নবিস সরকার দেশের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সহমতিতে বাস্তবায়িত করলো। রাষ্ট্রপতি গোহত্যা বন্ধের বিলে স্বাক্ষর করার পর গত ২ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীফড়নবিস ট্যুইট করেন— 'রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন! গোবংশ রক্ষা করার স্বপ্ন সফল হলো। এখন থেকে গোহত্যা করতে অথবা গোমাংস কেনাবেচা করতে ধরা পড়লে ৫ বছর জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।'

মুম্বইয়ের বিজেপি সাংসদ কিরীট সোমাইয়া বলেছেন, প্রায় ১৯ বছরের বিজেপি ও শিবসেনার দাবি এখন পূর্ণ হলো। এই কিরীট সোমাইয়া ও অন্য সাংসদরা দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে গোহত্যা বিরোধী আইন চালু করার দাবি জানালে রাষ্ট্রপতি তা মঞ্জুর করেন। রাজ্যের বিজেপি দলের মন্ত্রী সুধীর মুনগন্টিওয়ার পিটিআই-কে জানান, তাদের দীর্ঘদিনের দাবি আইনে পরিণত হওয়ায় শুধুমাত্র গবাদি পশুর রক্ষাই হবে না, কৃষিক্ষেত্রেও এর লাভ হবে ও উৎপাদন বাড়বে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারও গোহত্যা রোধে মডেল বিলের আগ্রহী। গোহত্যা নিষিদ্ধ করে যেসব রাজ্য আইন পাশ করেছে সেগুলি মডেল বিল হিসেবে অন্য রাজ্যেও বিতরণ করতে চায়। এর ফলে সব রাজ্য একই ধরনের আইন পাশ করানোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করতে পারবে। উল্লেখ্য, সংবিধানের ৪৮ ধারায় গবাদিপশু এবং দুগ্ধবতী ও ভারবাহী পশুর হত্যা বন্ধ করার নির্দেশ আছে। ২০০৫ সালে গুজরাটে গোহত্যা নিষিদ্ধ করে যে আইন আনা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট তার বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

সিপিএমে নতুন মুখ— সাদা রঙের বুদ্ধ

মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা

কমরেড বুদ্ধদেব,

আপনাকে দেখে না খুব 'মাস্টারমশাই' সম্বোধন করতে ইচ্ছে করছে। ছেলেবেলায় স্কুলে আমার এক শিক্ষক ছিলেন ঠিক আপনার মতো দাড়ির। ঠিক আপনার মতো ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি। তবে তুলনায় বেশ মোটা কাপড়ের। সে যাইহোক আপনাকে বেশ লাগছে। কবি কবি চেহারা। শান্ত, সৌম্য, স্নিগ্ধ, শুভ্র। ঠিক যেন বাল্মীকি মুনি। না তাবলে আপনার অতীতটাকে রত্নাকর দস্যু বলছি ভাববেন না প্লিজ।

৮ মার্চ, রবিবার ব্রিগেডে গিয়েছিলাম। না মাঠে নামিনি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাঠ দেখেছি, মঞ্চ দেখেছি। গত বিধানসভায় লজ্জাজনক হার এবং একের পর এক নির্বাচনে আপানাদের রক্তক্ষরণের পর দলের ঘরে-বাইরে নেতৃত্বে 'নতুন মুখ'-এর দাবি উঠেছিল। আমি তাই রাজ্য সম্মেলনের আগের জনসভায় নতুন মুখ খুঁজছিলাম মঞ্চে। কিন্তু সবই চেনা চেনা মুখ। সেই কারাত, ইয়েচুরি, বিমান, সেলিম, সূর্যকান্ত। হঠাৎ চোখ আটকে গেল। আরে দাড়ি গোঁফের সাদা জঙ্গলের আড়ালে মুখটা চেনা চেনা লাগছে, অথচ অচেনা। আসলে প্রকাশ্যে এই চেহারায় আপনাকে প্রথমবার দেখলাম। সেই যে হেরে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বিদায় নিলেন তারপর মহাকরণ গঙ্গা পার হয়ে নবান্ন হয়ে গেল কিন্তু আপনাকে দেখিনি। তারপর বুঝলাম, রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে। শহর সাজছে নীল সাদায়। তাই আপনিও নিজেকে বদলে ফেললেন। বাঃ নতুন মুখের খোঁজ চলছিল, মিলে গেল। অন্য বুদ্ধদেব। যিনি অপছন্দের সাংবাদিককে দেখে দাঁত কিড়মিড় করলেও কেউ বুঝতে পারবে না। 'পেইড ব্যাক বাই ইওর ওয়ন কয়েন' বললেও মনে হবে না তা প্রতিশোধের হুমকি, মনে হবে ঋষির মুখ থেকে বের হওয়া শান্তির বাণী। সূর্যোদয়ের কথা বললে মনে হবে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'।

হেরে গিয়ে ঘরে বসে যাওয়ার অনেক নজির আছে রাজনীতিতে। প্রথম দিকে নিজেকে যখন পাম এভিনিউয়ের বাড়িতে বন্দি করে রেখেছিলেন তখন তেমনটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল আপনার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট পর্যন্ত দৌড় বজায় আছে। রোজ নিয়ম করে পার্টি অফিসে হাজিরা দিচ্ছেন। কিন্তু পলিটব্যুরো, সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং নৈব নৈব চ। তারপর শহর কলকাতা ছাড়তে চাইলেন। এবার শুনছি পার্টির সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতেও চেয়েছেন। এক মুখ দাড়ি দেখে মনে হচ্ছে এবার যেন বানপ্রস্থে যাওয়ার জন্য আপনি তৈরি। সত্যি পার্টির একের পর এক হার দেখে কাঁহাতকই-বা সহ্য করা যায়। আর আপনারই ভাষায় 'বিপজ্জনক বিজেপি'-র ক্রমবর্ধমান শক্তি কষ্ট তো দেয়ই। এখনও সিপিএমের যে কোনো হারের জন্য বলা হয় আপনার জমানাই দায়ী। সেই সময়ে আপনি যা যা করেছেন তারই মাশুল গুনছে আপনার দল। বিদ্রোহী নেতারা যখন বলেন দলের নেতৃত্ব থেকে পচা মুখগুলো সরাতে না পারলে নতুন করে সংগঠন শক্ত করা যাবে না তখন সেটা যে আপনাকে লক্ষ্য করেই বলা হয় সেটা আপনার থেকে কে বেশি বুঝবে বুদ্ধবাবু! আপনার মুখ না বদলালে নাকি হারানো ভোটার আর ফিরে আসবে না! এবার তো আপনি সত্যি সত্যিই মুখ বদলে নিলেন। নতুন লুকের নতুন একটা নামও নিয়ে নিতে পারেন। মানে এক রেখে এই ধরুন তথাগত। না, ওই নামে আবার বিজেপি-র নেতা আছে। গৌতম তো আপনার দলেরই দেব। তবে সিদ্ধার্থ? না সেটাও বিজেপি-র দখলে।

না, আর সাজেশন দেব না, বাংলা ভাষায় আপনার ব্যুৎপত্তি শুনেছি রাজনীতির থেকে প্রগাঢ়। সুতরাং আপনিই একটা ভালো দেখে নাম বেছে নেবেন। দেখুন না কাজ হয় কিনা।

তবে আপনার দলের বন্ধুবান্ধব মানে কমরেডরা খুব চালাক। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতি বসুর মতো আপনিই হতেন ব্রিগেড সমাবেশের শেষ বক্তা। মানে সভার মধ্যমণি। ক্ষমতা যাওয়ার পর আপনি টুক করে নিজের বক্তৃতাটুকু দিয়েই শরীর খারাপের কারণে বাড়ি চলে যেতেন। এদিন দেখলাম সেটা আর করতে পারলেন না। আপনাকে সভাপতি বানিয়ে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছেড়ে দিল দল। নিজে সেভাবে বক্তৃতা দেওয়ারও সুযোগ পেলেন না। কিন্তু শেষ বক্তা সূর্যকান্ত মিশ্রের নাম পর্যন্ত ঘোষণা করে যেতে হলো।

তবে কি নতুন মুখ নিলেও দলের লোকেরা আপনাকে 'পচা মুখ' হিসেবে নেতৃত্ব থেকে একটু দূরেই রাখতে চাইছে। সেটা বুঝেই কি আপনি বানপ্রস্থের পরিকল্পনা জানিয়ে রেখেছেন?

—সুন্দর মৌলিক

মমতাকে সবক শেখানোই মুকুলের লক্ষ্য

কলকাতার রাজনীতির বাজারে এখন একটা জোর গুজব চলছে যে দলে অসম্মানিত মুকুল রায় নতুন দল তৈরি করছেন। যদি নতুন দল করেন তবে সেটা কবে? সাধারণ বুদ্ধিতে বলে বিধানসভার নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই মুকুল রায় এমন একটা পদক্ষেপ করতে পারেন। কারণ মুকুলবাবু স্বাভাবিকভাবেই চাইবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা জোর ধাক্কা দিতে। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে নতুন দল করা ছাড়া মুকুলবাবুর সামনে দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। মুকুল রায় বিজেপিতে যেতে পারেন বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা মস্ত বড় ভুল করছেন। এমন কিছু হবে না। হতেই পারে না। বিজেপি-তে যোগ দিয়ে মুকুল রায়ের কোনো রাজনৈতিক লাভ নেই। তৃণমূলের একদা দু' নম্বর নেতা সর্বভারতীয় বিজেপি দলের তৃতীয় সারির নেতাও হতে পারবেন না। রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন সাংসদ সম্পাদক এম জে আকবর হাওয়া বুঝে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। ঘটা করে তাঁকে দলের মুখপাত্রও ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর আপনারা ক'বার তাঁর নাম শুনেছেন? মুকুল রায়ের লক্ষ্য, মমতাকে শিক্ষা দেওয়া। তার জন্য প্রয়োজন দলে ভাঙন ধরানো। সেই ক্ষমতা তাঁর আছে। দলের জন্ম থেকে গত ১৬-১৭ বছর তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান সাংগঠনিক নেতা ছিলেন। আজও দলের সংগঠন তাঁর হাতেই আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের চেয়ারপারসন হতে পারেন। কিন্তু জেলাস্তরের কর্মীদের তিনি চেনেন না। যেমন প্রয়াত জ্যোতি বসু সিপিএমের প্রথম সারির মাত্র কয়েকজন সাংগঠনিক নেতাকে চিনতেন। জেলাস্তরের নেতা-নেত্রীদের কাউকেই চিনতেন না। সংগঠন চালাতেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, অনিল বিশ্বাস, বিমান বসুরা। জ্যোতি বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা দলের শোপিস। মুকুল রায় নতুন দল গড়লে তৃণমূল কংগ্রেস আড়াআড়িভাবে ভেঙে যাবে। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া কিছু মন্ত্রী এবং বিধায়ক মমতার পাশে থাকলেও জেলাস্তরের নেতা ও কর্মীরা মুকুল রায়ের ডাকে সাড়া দেবেন তাতে সন্দেহ নেই।

গূঢ় পুরুষের কলম

আবার বলছি, রাজ্য রাজনীতিতে থাকতে গেলে মুকুল রায়ের সামনে নয়া দল গড়া ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কোন সময়ে আঘাত হানবেন তিনি। পুরভোটের আগে অথবা পরে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে চলতি মার্চ মাসের শেষদিকে তিনি নতুন দল ঘোষণা করতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় তাঁর অনুগামী নেতাদের নিয়ে কলকাতায় দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। তুণমূল কংগ্রেস ভেঙে নতুন দল গড়ার ব্যাপারে সকলেই সহমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, মুকুল অনুগামীরা বুঝেছেন দলে তাঁদের স্থান নেই। জোর ধাক্কা দিতে না পারলে মমতা তাঁদের পাত্তা দেবেন না। বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে তৃণমূলের দলীয় প্রার্থীর ভোট কাটতে হবে। সেক্ষেত্রে মুকুল রায় এবং মমতার দুটি দলেরই প্রার্থীদের হারতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি যতটা বুঝি তাতে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের কোনো বিরোধী দলের সঙ্গে জোট করবেন না। যদিও একটা রটনা আছে যে গোপনে তাঁর সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য নেতাদের একটা বোঝাপড়া আছে। বলা হয় 'একই বৃন্তে দুটি ফুল, সিপিএম আর তৃণমূল'। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এমন আত্মঘাতী বোঝাপড়া সম্ভব নয়। মমতা সিপিএমকে অক্সিজেন দিয়ে বিজেপি-র উত্থানকে রোধ করতে চাইতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনী জোট করাটা অসম্ভব। মমতার প্রধান রাজনৈতিক শত্রু বিজেপি-র সঙ্গেও তাঁর দলের জোট সম্ভব নয়। কিন্তু মুকুল রায়ের দল বিজেপি-র সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই পারে। বিজেপি তাঁর ঘোষিত রাজনৈতিক শত্রু নয়। মুকুল রায় প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গেও বোঝাপড়ায় যেতে পারেন। সেটাই বেশি স্বাভাবিক। মুকুল রায়-সহ তাঁর অনুগামীরা একদা কংগ্রেসেই ছিলেন। সেখানেই তাঁরা স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। প্রদেশ কংগ্রেসের এখন যা হাল তাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বাইরে একটি আসনও জেতার শক্তি নেই। তাই নতুন দল করলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হতেই পারে।

তবে মনে হয় বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কোনোরকম জোট হবে না। গোপন বোঝাপড়া কোথাও কোথাও হতে পারে। মুকুলবাবু কংগ্রেস এবং বিজেপি-র সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলার চেষ্টা করবেন। কারণ, তাঁর লক্ষ্য মমতাকে সবক্ শেখানো। মমতার ভরসা রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট। এই ভোটব্যাঙ্ক মমতার শক্তি। মুকুলবাবু এখানে ভাঙন ধরাতে না পারলে রাজনৈতিক বদলা নিতে পারবেন না। মমতা জানেন জেহাদি জঙ্গি, জালনোটের কারবারিরা যতক্ষণ সঙ্গে আছে নির্বাচনে তাঁকে বা তাঁর দলকে হারানো কঠিন। এরা অতীতে যতদিন সিপিএমের সঙ্গে ছিল ততদিন বামেরা ছিল অপরাজেয়। এই রাজ্যে হিন্দু ভোটদাতারা মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের চক্র ব্যর্থ করতে না পারলে অরাজকতা চলবেই। রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটদাতারা ৭০ শতাংশ ভোটদাতাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। এটাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নিয়তি।

সংবিধানের 'সেকুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দ দুটি নিয়ে বিতর্ক হোক

মূল উদ্দেশিকায় 'সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ (?) (সেকুলার মানে কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ নয়) শব্দগুলি ছিলই না। ২৬ বছর পর ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই শব্দগুলি সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধনের কথা উল্লেখ না করে এই সংযোজন-সহ উদ্দেশিকাকে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গ্রহণ করছি বলা যায় কি? ছাত্রছাত্রীরা শুরুতেই এই মিথ্যাচার ও জালিয়াতির সম্মুখীন কেন হবে? ইতিহাসকে কৌশলে বিকৃত করার এই অপচেষ্টা কেন?

দেবীপ্রসাদ রায়

শিবসেনা উত্থাপিত সংবিধানের উদ্দেশিকা (Preamble) সংশোধন একটি বহুকাঙ্ক্ষিত এবং বহুপ্রতীক্ষিত বিষয়। এটি আসলে সংশোধনের সংশোধন। কারণ আমাদের সংবিধান যে উদ্দেশিকা নিয়ে প্রথম রচিত হয়েছিল— সেই উদ্দেশিকাকে পরিবর্তিত করা হয়েছিল, পরিবর্ধিত করা হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। অভিজ্ঞতা বলছে সেই পরিবর্ধন মোটেই সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য হয়নি পরন্তু তা হয়েছিল বিশেষ গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য। ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান আমরা গ্রহণ করেছিলাম তার উদ্দেশিকায় ছিল ভারত হবে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা সবার জন্য সামাজিক ন্যায় দিতে পারবে। এই সংবিধানই ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর আমরা গ্রহণ করছি বলে বলা হয়েছিল। সেই সংবিধান গ্রন্থটি অলংকৃত হয়েছিল ভারতীয় ইতিহাস সমাজ সংস্কারের পরিচয় জ্ঞাপক চিত্রাবলীর দ্বারা। এই সংবিধান চালু হয়েছিল ১৯৫১ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুল পাঠ্যবইতে আবশ্যিক ভাবে মুদ্রিত থাকা সংবিধানের যে উদ্দেশিকা দেখছে তা হলো এইরকম :

''আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এতদ্বারা সংবিধান গ্রহণ বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র বর্ণনায় এই উপস্থাপন কিন্তু মূল সংবিধানের উপস্থাপন থেকে কিছুটা আলাদা। মূল উদ্দেশিকায় 'সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ (?) (সেকুলার মানে কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ নয়) শব্দগুলি ছিলই না। ২৬ বছর পর ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই শব্দগুলি সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধনের কথা উল্লেখ না করে এই সংযোজন-সহ উদ্দেশিকাকে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গ্রহণ করছি বলা যায় কি? ছাত্রছাত্রীরা শুরুতেই এই মিথ্যাচার ও জালিয়াতির সম্মুখীন কেন হবে? ইতিহাসকে কৌশলে বিকৃত করার এই অপচেষ্টা কেন? ভারতীয়দের তাদের প্রকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখার অভিপ্রায়েই এই অপচেষ্টা। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবাসীকে তাদের সংস্কৃতি থেকে বিযুক্ত করার যে পরিকল্পনা লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক প্রতিবেদনে রেখেছিলেন তাঁর অনুগামীরা ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেই পরিকল্পনাকেই সম্পূর্ণ করতে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সচেষ্ট হতে থাকেন। এবং নিজের ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী করতে ইন্দিরা গান্ধী তথাকথিত মার্কসবাদী প্রগতিশীলদের হাতে শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষমতা তুলে দিলেন। এই মার্কসবাদী প্রগতিশীলরা সংবিধানে প্রবিষ্ট সেকুলারিজম ও সোস্যালিজম্ শব্দ দুটিকে ঢাল করে ভারতীয়ত্ব বোধের সর্বনাশ সাধনে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা তুলে ধরার আগে ওই বিভ্রান্তিমূলক শব্দ দুটির প্রসঙ্গে আসা যাক।

সেকুলার শব্দটি লাটিন Seculusm থেকে নেওয়া। খৃষ্টীয় পরিভাষায় এর অর্থ হলো— যা চার্চ সংক্রান্ত নয় বা যাজকীয় নয়— Non ecclasiastical বা Non religious বা Non sacred অপবিত্র, Profane। রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মযাজকদের ভ্রষ্টাচারে ইউরোপের সাধারণ মানুষ যখন উৎপীড়িত, ক্লিষ্ট এবং হতাশাগ্রস্ত তখন চার্চের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনই রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে Non ecclasiastical বা সেকুলার রাষ্ট্র চিন্তার উদ্ভব ঘটায় যা প্রথমদিকে যতটা না ঈশ্বর-বিরোধী ছিল তার চাইতে অনেকবেশি ছিল চার্চবিরোধী। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজচিন্তায় এই চার্চবিরোধী মানসিকতা শেষ অবধি ঈশ্বর-বিরোধিতায় উত্তীর্ণ হয়ে সেকুলার শব্দটিকে একটি রেনেসাঁসধর্মী মহিমা প্রদান করে। ইতালিতে মেকিয়াভেল্লিই প্রথম রাজনীতিকে ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রের আনুগত্য থেকে মুক্ত করতে প্রয়াস পান। সেকুলার বা ঈশ্বর-স্বীকৃতিবিহীন, ধর্মহীন রাষ্ট্রনীতির জন্ম হয়— ইউরোপে এই ভাবেই। প্রায় দুশো বছর ধরে তর্কবিতর্ক আলোচনার শেষে বাস্তবমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্রীয় চিন্তার উদ্ভব হয় যেখানে

ঈশ্বরের, ধর্মের অস্তিত্বই অনাবশ্যক, যুক্তিহীন। চিন্তার পথ যুক্তির পথ, যুক্তির পথ বিজ্ঞানের পথ, বিজ্ঞানের পথ কল্যাণের পথ চিন্তা করতে সক্ষম মানুষই সব ধর্ম বা ঈশ্বর অপ্রাসঙ্গিক, বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটাই গ্রহণীয়। এ কথা প্রায় অনস্বীকার্য যে সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভবের পথ ছিল সঠিক। কিন্তু সে চিন্তার বাস্তবায়ন এবং ব্যাপকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিবর্তনের ইতিহাসে মানবপ্রজাতির মানসিকতার বর্তমান অবস্থানে ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তার প্রভাবের মাত্রায় মূল্যায়ন হয়নি ঠিকমতো। যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে জনমানসের অন্তর্লোকে বিপ্লব ঘটানোর দরকার ছিল তা হতে পারেনি। মানব প্রজাতির উপর ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রভাব এখনো অবধি অনস্বীকার্য।

১৯৭৬ সালে ভারতীয় জনমানসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে ভারতকে 'সেকুলার' বা ঈশ্বরবিরোধী (সেকুলার মানে ঈশ্বরবিরোধী, কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ নয়) ঘোষণা করাও ছিল হঠকারিতা এবং মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে এখন, যে তা ছিল অসদুদ্দেশ্যমূলক। ভারতীয় জনসাধারণ কি ঈশ্বরবিরোধী? কয়েকজনের পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রবণতার দায় বহন করানোর জন্য সেকুলারিজমকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাষ্য প্রদান করে সেই চাদরে ভারতকে আবৃত করা যায় না করা উচিত? কিছুকাল আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি ও মূর্তির অপসারণ দাবি করেছিল। চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল এই ধৃষ্ট আচরণে। কিন্তু কেন তারা এটা করেছিল? সেকুলার মানে ঈশ্বরবিরোধী সংবিধানমতো ভারত সেকুলার রাষ্ট্র। সুতরাং ঈশ্বরবিরোধী সংবিধানমত ভারত সেকুলার রাষ্ট্র। সুতরাং ঈশ্বর-বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি-প্রতিকৃতি থাকাটা সংবিধান-বিরোধী— এই ছিল তাদের অভিমত। স্বামীজীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে নিয়ে এই বিভ্রান্তির কারণ কি? কারণ ওই 'সেকুলার' শব্দকে সংবিধানে ঢোকানো এবং তা ভারতীয় জনচিত্ত অনুধাবন না করেই, আমরা দেশ জুড়ে এই ঘটনায় বিস্মিত। বেদনার্ত হলেও ছাত্রদের নিন্দা করতে পারি কি? সুতরাং এই বিভ্রান্তি নিরসনে শিবসেনা যে প্রশ্ন তুলেছে 'সেকুলার' ও 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র নিয়ে তা প্রশংসনীয় এবং গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো। তথাকথিত প্রগতিশীল এবং তাদের অনুসরণে প্রগতিশীল হতে মরিয়া কিছু মানুষ দেশে হৈ চৈ তুললেও বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

স্ট্যালিনও স্লোগান তুলেছিলেন, চালু করেছিলেন, "The fight for godlessness is fight for socialism." অর্থাৎ সোস্যালিজম ও সেকুলারিজম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর (১৯৫০) কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল এই স্লোগানের অসারতা। তৎকালীন পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শিশুদের মধ্যে ৬০ শতাংশ চার্চ দ্বারা ব্যাপটাইজড হয়েছে, ১৫ শতাংশ বিবাহ, ৩০ শতাংশ মৃত্যু অনুষ্ঠান চার্চ অনুশাসনেই হয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ ছিল মহিলা, তার মধ্যে ৭০ শতাংশই ঈশ্বরবিশ্বাসী। আর আজকের ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ রাশিয়ার কী অবস্থা ধর্ম অবস্থান নিয়ে তা সহজেই অনুমেয়। লেনিনগ্রাদ সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ ফিরে এসেছে! এবং সেকুলারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে থাকার ফলে দুটি শব্দই বর্জ্যপদার্থ স্তূপে আশ্রয় নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলেই এই কনসেপ্টগুলির পতন ঘটেছে তা কিন্তু নয়। ইতিহাস বলছে, আলেকজান্ডার সোলঝিনিৎসিনের চিঠি বলছে (যে চিঠি চেপে দিয়েছিল সোভিয়েট সরকার)। এইসব কনসেপ্টের পতনই ত্বরান্বিত করেছে সোভিয়েট রাশিয়ার পতন। মানব প্রজাতির উপর ধর্ম বা ঈশ্বরের প্রভাব (বৈজ্ঞানিক হোক বা অবৈজ্ঞানিকই হোক) চিন্তা করেই সম্ভবত জন লক, ভলটেয়ার, মন্টেস্কু, ডি. এলামবার্ট রুশো প্রমুখ ধর্মহীনতা নয়, পরধর্মসহিষ্ণুতার উপরই জোর দিয়েছিলেন তাঁদের রাষ্ট্র-সমাজ চিন্তায়। মূল ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশিকাতেই ভারতীয়দের যুগ যুগ অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা নিহিত ছিল, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য নিছক বিজ্ঞাপনধর্মী শব্দ 'সেকুলার' বা 'সোস্যালিস্ট'-র প্রয়োজনই অনুভূত হয়নি। কী কারণে এই শব্দ প্রতিষ্ঠা করানোর জন্য উৎসাহীরা আম্বেদকর প্রমুখকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী ভেবেছিলেন তা জানা যায় না। ভারতে যুগ যুগ ধরে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতা যখন খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বারা আক্রান্ত হলো তখন আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়-এর উদ্ধৃতি সময়োপযোগী, "It is well known to the whole world that no people on earth are more to lerant than the Hindoos, Who belive all man to be equally within the reach of Divine beneficence which embraces the good of every relgious Sect or denominations. (The Brahmirical Magazine, Second edition)। এই সব প্রগতিশীল সেকুলারবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় লেনিনের এক চিঠির প্রতি। মার্কসীয় আদর্শের রূপায়ণ-দায়িত্ব নিয়েও লেনিন সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতার প্রবক্তা হননি, বাস্তববোধে। জারের কাছে বিপ্লবীদের পেশ করা এক দাবিপত্র প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন— "The Statement not concern itself with religions Societies, must not be connected with state power. Every one Should be absolutely free to profess what clear religion he must be no discrimination whatever in the rights of Citizens on religious grounds...no state grants must be made to ecllasiastic and religious societies which must become absolutely ! Dependent Voluntary associations of like minded citizens." ["Sosializm, "religiyes" in Polnoc Sobranic Sochineii Moscow 1960 : The Radical Humanist 41No2]

এবারে আমাদের প্রগতিশীলদের আসল ভূমিকা কী ছিল মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রের কথাই ভাবুন : (১) শাহবানু মামলা— মুসলিম বিল, (২) তসলিমা নাসরিন ও সলমন্ রুশদির প্রতি আচরণ, (৩) সরকারি খরচে বমফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে 'বনবিবি' পূজা, (৪)

পশ্চিমবঙ্গ থেকে তসলিমাকে তাড়ানোর জন্য দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দেওয়া, (৫) ইমামদের ভাতা বাড়ানো, (৬) নির্বাচনের সময় মসজিদের (ইমামের) ফতোয়া ভিক্ষা করা —ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এইসব প্রগতিশীলদের জন্যই উদ্দেশিকায় ঢুকেছিল সেকুলার এবং সোস্যালিস্ট শব্দ দুটি। ১৯৭৬ সালের পর থেকে সেকুলার এবং সোস্যালিস্ট' শব্দ দুটির ঘটমান তাৎপর্য দেখেই প্রাক্তন ইউ এন পদাধিকারী (পাক্) আনসার হোসেন খান তাঁর পুস্তক Rediscovery of India (Orient Longman) লিখেছেন— এই সেকুলার ভারতের চেয়ে হিন্দু ভারতে মুসলিমরা স্বস্তিতে থাকত— লিখেছেন ''India was never Secular needs not be Secular...''

সেকুলার এবং সোস্যালিস্ট ভারতের প্রবক্তাদের আরো কিছু ভূমিকা তুলে ধরি। ইন্দিরা গান্ধীর আনুকূল্যে শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা পেয়ে ICHR [Indian Council of Historical Research] দখল করলেন এঁরা। ইতিহাস লেখা ও গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ পেয়ে প্রচুর নয়ছয়ের ঘটনা ঘটতে থাকল। Asain Age 9th August 1998 জানালো, ''The ICHR has over the years transformed into a Vortex into which an increasing number of research work and a Spriralling sum of funds regularly vasishes.''

ম্যাক্সমূলার উপস্থাপিত আর্য আক্রমণ তত্ত্বের 'যদি, সম্ভাবনা, অনুমান'— এসব ভিত্তি করেই ভারতের ইতিহাস লেখা হতে থাকল তাঁদের উদ্দেশ্য মতো। ম্যাক্সমূলার তাঁর তত্ত্বকে শেষ বয়সে মিথ্যাচার ও পাপ বলে বর্ণনা করলেও, কার্যত নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, লুপ্ত জনপদ আবিষ্কার সত্ত্বেও, পূর্বসূরি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকদের অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে যথেচ্ছাচার চলতে থাকল— আর্যরা অসভ্য, বর্বর, অক্ষরজ্ঞানহীন, ঈশ্বর উপাসনা আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে নয়, ঐতিহ্য সম্পদে লাভের জন্য; স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হীনভাবে দেখানো হলো— চলতে থাকল ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মার প্রমুখের আধিপত্যতে। জাতীয় স্মারকগুলির প্রতি অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গি এমনকী যে বৈদিক সরস্বতী নদীর খাত ধরা পড়ল উপগ্রহ চিত্রে— তা নিয়ে পরমাণুদপ্তর—মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদির সংযুক্তিকে হিন্দুত্ববাদের প্রসার ও প্রচারমনস্ক বলে চিহ্নিত হলো। এরই মাঝে ইতিহাসকে বিকৃত করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু গান্ধী এবং নেহরু পরিবারের অবদান— এই ধারণা চিরস্থায়ী করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে ধাতব কালখণ্ড (Time Capsal) তৈরি করে তা মহাত্মা গান্ধীর সমাধির নীচে প্রোথিত করা হয়। পূর্বোক্ত ইতিহাসবিদরা নীরব সমর্থন জানিয়েছিলেন। এসবই হয়েছিল 'সেকুলার ও সোস্যালিস্ট' শব্দ দুটিকে চালু করে— তাদের মহিমান্বিত করে। ভারতবাসী এই ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতা (Pseudo Secularism) ও মার্কসিস্ট সোস্যালিজম্-এর বিষে জর্জরিত গত ৬টি দশক ধরে, এ থেকে মুক্তি চায়। কাজেই এই ভণ্ডামির মূল উৎপাটনের জন্য শিবসেনার সাহসী প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা হোক, আলোচনা হোক। এটা ভীষণ দরকার। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করতে হবে, ''বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দূরাদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেউই না। আগন্তুকবর্গই সব।''

প্রকৃত ইতিহাস রচনার বাতাবরণ তৈরিতে সংবিধান উদ্দেশিকার (বর্তমান রূপ) পুনঃসংশোধন চাই।

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের

একাত্ম মানববাদ প্রসঙ্গ

(৮ খণ্ডে, মূল্য : ১৫০০ টাকা)

প্রাক্ প্রকাশনা বুকিং ১০০০ টাকা মাত্র

—ঃ গ্রাহকপত্র সংগ্রহের স্থান ঃ—

কেশব ভবন

৯এ, অভেদানন্দ সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

যোগাযোগ : শ্রী অরবিন্দ দাশ - ৯৪৩২৪৩৫৫৫৬

কেন্দ্রীয় বাজেট

নতুন আশা ও কিছু প্রশ্ন

অম্লানকুসুম ঘোষ

কেন্দ্র বা রাজ্য যে কোনো সরকার কি রূপরেখা নিয়ে কাজ করতে চলেছে বা তাদের কাজের গতি কি হারে হবে তা বোঝা যায় সেই সরকারের আর্থিক বাজেট দিয়ে। এক কথায় বলা যায় কোনো সরকার কেমন বাজেট পেশ করল তার দ্বারাই বোঝা যায় তারা প্রকৃতই জনসাধারণের উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর না জনমনোরঞ্জনের ধুয়ো তুলে নিজেদের

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

আখের গুছোনোই তাদের লক্ষ্য। সেই জন্য বহু আশা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসা নরেন্দ্র মোদীর সরকারের দ্বিতীয় আর্থিক বাজেট এবার সকলেরই আগ্রহের বিষয় ছিল। সেই আগ্রহের ফলাফল একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

বর্তমান বাজেটের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দিকটি হয়তো ততটা আলোচিত হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতের নিরিখে এর গুরুত্ব অপরিসীম যেটি হলো গোল্ড ব্যাঙ্ক। যে কোনো ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব সোনা এই ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারবেন, বদলে আমানতের ওপরে সুদের মতো সোনার ওপরে সোনার বর্ধিতাংশ পাবেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের ঘরে থাকা অপ্রয়োজনীয় সোনা এই ব্যাঙ্কে জমা রেখে নিজেদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে পারবেন। এই সঞ্চিত সোনা আবার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রয়োজন মতো ধার নিয়ে স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করতে পারবেন। সাধারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই এই গোল্ড ব্যাঙ্কের ভূমিকা নেবে। এর ফলে অর্থনীতিতে লাভ হবে বহুরকম। প্রথমত, ঘরে সঞ্চিত সোনার বদলে নিয়মিত আয়ের মুখ দেখবেন সাধারণ মানুষ। ফলে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ফলস্বরূপ চাহিদা-বৃদ্ধি এবং ফলত উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতির উন্নয়ন। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীরা স্বল্প সুদে স্বর্ণমান পাবেন। ফলে স্বর্ণশিল্প উৎসাহিত হবে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলাফল সেই ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চাহিদা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ফলে পুনরায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। অর্থনীতির এই উন্নয়ন চক্রে একবার আসীন হোতে পারলে জিডিপি-র বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। আবার পুনরুজ্জীবিত স্বর্ণশিল্প রপ্তানিযোগ্য হলে তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আগমণের পথও প্রশস্ত হয়। ফলে বাণিজ্যিক ঘাটতি হ্রাস পায়। ফলে অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। তৃতীয়ত, সবচেয়ে বড় লাভ হলো এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চিত সোনা দেশের বাজারের সোনার চাহিদাকে পূরণ করবে। ফলে বিদেশ থেকে সোনা আমদানি করতে হবে না। বিদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার টন সোনা আমদানি করে ভারত। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা। এই অর্থ প্রতিবছর বিদেশে চলে যায় দেশ থেকে, দেশের মোট আমদানির এক-শতাংশ হলো সোনাজনিত ব্যয়। অথচ ভারতের সাধারণ মানুষের হাতে সঞ্চিত রয়েছে প্রায় কুড়ি হাজার টন সোনা। যে সোনা ভল্ট, লকার, আলমারির শোভাবর্ধন করে মাত্র। নতুন নীতির ফলে এই সোনা বাজারে আসার ফলে আমদানিজনিত খরচ হ্রাস পাবে প্রায় সতেরো শতাংশ। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ঘাটতি কমাই নয়, এর ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রামানের সাপেক্ষে টাকার দামও বাড়বে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতের স্থান আরও দৃঢ় হবে। এবং উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা উন্নতমানের যন্ত্রাংশে আমদানিতে ব্যয় হবে। ফলে দেশের শিল্পায়ন ঘটবে দ্রুত গতিতে, ফল সেই উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং তার ফলে পুনরায় রপ্তানি বৃদ্ধি তার ফলে পুনরায় বৈদেশিক মুদ্রাগম এবং নতুন শিল্পস্থাপন, ফলে পুনরায় রপ্তানি বৃদ্ধি। উন্নয়নের এই চক্রে একবার আরোহণ করতে পারলে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া ভারতের পক্ষে শুধু সময়ের অপেক্ষা। চতুর্থত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এই গোল্ড ব্যাঙ্কের কাজ করায় তারা লাভবান হবে। তাদের মোট ব্যবসা বাড়ায় তাদের লভ্যাংশও বাড়বে, ফলে তারা উন্নতমানের গ্রাহক পরিষেবা দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে নতুন ভাবে শক্তিশালী

করবে। তবে এই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে সময় লাগবে, কারণ একদম নতুন এই প্রকল্প সাধারণের মধ্যে গৃহীত ও অনুমোদিত হতে এবং বাণিজ্যজগতের কাছে বরণীয় হতে লেগে যাবে বেশ কয়েক বছর। তবে দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনা যে গৃহীত হয়েছে তার থেকে সোনালি সুদিনের আশা করাই যায়।

দীর্ঘমেয়াদি আর একটি পদক্ষেপ হলো পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সত্তর হাজার কোটি টাকা বাড়তি বিনিয়োগ। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তার দাম না কমিয়ে (অর্থাৎ জনমনোরঞ্জনী নীতি না নিয়ে), তার ওপর ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকা থেকেই এই বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে। নিত্যনতুন বিনিয়োগ আসবে। এর ফলে ছ' রকমভাবে অর্থনীতি উপকৃত হবে। দু' রকম উন্নয়ন-চক্রে আরোহণ করবে ভারতীয় অর্থনীতি। প্রথমত, বিনিয়োগ বাড়ায় কর্মসংস্থান বাড়বে, ফলে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, ফলস্বরূপ চাহিদা বৃদ্ধি এবং তার ফলে আবার উৎপাদন বৃদ্ধি হলে পুনরায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ বাড়ায় রপ্তানি বাড়বে, ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়বে ফলস্বরূপ বাড়বে নতুন বিনিয়োগ। এই দ্বিতীয় উন্নয়ন-চক্র প্রথম উন্নয়ন-চক্রকে সচল করতে সাহায্য করবে। এবং পেট্রোলের দাম না কমায় পেট্রোলের চাহিদা বাড়বে না, ফলে ভারতের আমদানিজনিত বৈদেশিক মুদ্রা— ব্যয়ও বাড়বে না। ফলে অর্থনীতির সম্ভাব্য অধোগতিও এড়ানো সম্ভব হবে। আপাত জনমনোরঞ্জনী রাজনীতির মধ্যে না গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ধন্যবাদার্হ।

পরিষেবা কর বৃদ্ধি ও আয়করের হার এক রাখা, এটি বর্তমান ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার নতুন পদক্ষেপ। এর ফলে সরকারের আয় বাড়বে ও সরকারি আয় ব্যয় ঘাটতি (fiscal deficit) কে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। এছাড়া নানা ধরনের ভরতুকি প্রকল্পের অপ্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছাঁটাই করেও সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করার চেষ্টা দেখা গেছে বাজেটে।

আগে থেকেই অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নতুন খনি নীতি নিয়ে এবং জন-ধন-প্রকল্প ইত্যাদি নানারকম ভরতুকি প্রদানকারী ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতির চলার পথ সুগম করেছিল। নতুন খনি নীতিতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারেরই প্রচুর আয় হবে। ফলে পরিকাঠামোজনিত ব্যয় আরও বাড়বে। দ্বিতীয়ত, জন-ধন-প্রকল্প ইত্যাদির দ্বারা ভরতুকি সকলের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। ফলে দুর্নীতির সুযোগ থাকবে না। ফলে উপকৃত হবে জাতীয় অর্থনীতি।

কালো টাকা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পদক্ষেপ করেছে। কালো টাকা যাতে নতুন করে বিদেশাভিমুখে গমন না করতে পারে সেজন্য নতুন আইন করতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা। এছাড়া বাকি সব দিকে বর্তমান বাজেট পূর্বসূরির পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং সরকারের নিখুঁত পরিকাঠামোর জোরে জিডিপি বেড়েছে এবং Fiscal ও Current A/C deficit কমেছে।

কিন্তু কিছু প্রশ্নও থেকে যায়। পূর্ণচন্দ্রেও যেমন কলঙ্ক থাকে, সূর্যের বক্ষদেশেও যেমন থাকে সৌরকলঙ্ক, তেমনই এই আপাতসুন্দর বাজেটেও আছে কিছু প্রশ্নের অবকাশ। প্রথমত, সম্পদ কর বিলোপ। সম্পদ কর হলো যে সব ব্যক্তির তিরিশ লক্ষ টাকার বেশি সম্পদ (স্থাবর ও অস্থাবর) আছে। সেই সম্পদের ওপর ১ শতাংশ হারে কর নেওয়া হোত। সেই কর থেকে সরকারের প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো বার্ষিক আয় হোত। বারো লক্ষ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে সেই অঙ্ক হয়তো তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এই সম্পদ করকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা দিয়ে সরকারের এবং দেশের অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যেত। যেমন, যাদের সম্পদ দশ কোটি টাকা বা তার বেশি তাদের সম্পদের ওপর ১ শতাংশের বদলে পাঁচ শতাংশ কর বসালে সরকারের সম্পদ কর খাতে বাড়তি আয় হোত প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা। এই আয় থেকে পরিকাঠামো খাতে বর্তমান ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ খরচ করা সম্ভব হোত। আবার বিভিন্ন রাজবংশের যে স্থাবর সম্পত্তি (প্রাসাদ, বাগান ও সম্পত্তি) আছে, তার মূল্যায়ন করা হয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালে, রাজবংশগুলির ভারতভুক্তির সময়েই। কিন্তু তৎপরবর্তীকালে আর পুনর্মূল্যায়ন হয়নি। ফলে তাদের ওপর সম্পদ করও সেই আমলের হিসেবেই নেওয়া হোত। যদি সেই সম্পদগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা হোত এবং তাদের নতুন মূল্যের ওপর সম্পদ কর ধার্য করা হোত, তাহলেও সরকারের আয় হোত প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার বেশি। সেই বাড়তি আয়ও সরকারের fiscal deficit হ্রাসে সহায়ক হোত। কিন্তু সেসব সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করে সম্পদ করকে তুলেই দেওয়া হলো। কিন্তু কি কারণে? প্রশ্নের সদুত্তর অন্তত বাজেটে ফেলেনি। দ্বিতীয়ত, কালো টাকার নতুন করে বিদেশাভিমুখী গমন ঠেকানোর জন্য আইন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইতিপূর্বে বিদেশের বুকে স্থায়ী ঠিকানা করে নেওয়া কালো টাকা কীভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে কোনো দিশা দেখা গেল না এবারের বাজেটে।

অবশ্য ভালো-মন্দ নিয়েই সকলের পথ চলা। কোনো কিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু তার মধ্যেই বিশ্লেষণের শেষে একথা বলাই যায় যে এবারের বাজেট সত্যিই নতুন এক যুগের দিশা দেখিয়েছে। সোনালি স্বপ্নকে এনে দিয়েছে চোখের সামনে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বিজেপি সরকারের ঘোষিত নীতি ও কেন্দ্রীয় বাজেট

এন সি দে

যে কোনো স্বাধীন, সার্বভৌম, জাতীয় সত্তা-বোধ বিশিষ্ট রাষ্ট্রের বাজেটের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে দেশ ও জাতির অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে রক্ষা ও শক্তিশালী করা। তাই কোনো রাষ্ট্রের বাজেটের পর্যালোচনার সময় এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি রক্ষিত হয়েছে কিনা তা দেখাটা বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রের নতুন সরকারের পূর্ণ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেটের পর্যালোচনার ভিত্তিও হোক এই লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এটা সত্য যে বিগত ১০ বছরের কংগ্রেস সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল চরম বিপন্ন। অর্থনীতির সর্বাঙ্গে ছিল ঘাটতি আর ঘাটতি। রাজকোষ ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি, রাজস্ব ঘাটতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘাটতি মেটানোর একটিই রাস্তা জানা ছিল কংগ্রেস সরকারের। তা হলো দেশীয় রাষ্ট্রায়ত্ত মূল শিল্পের শেয়ার দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন ও তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস ওঠা জনগণের উপর থেকে ভরতুকি তুলে দিয়ে উপার্জন বাড়ানোর বাহাদুরি দেখানো।

আগের সরকারটি ছিল বিদেশি পুঁজিপতিদের অনুগত কংগ্রেস দলের। এই সরকারটি জাতীয় শিল্প, জাতীয় অর্থনীতি এবং জাতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও পুঁজির বিকাশে বিশ্বাসী বলে পরিচিত বিজেপি দলের। এবার দেখা যাক এই সরকারের বাজেটে এই দলটির ঘোষিত নীতি আদর্শ কতটা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমেই দেখা যাক রাজস্ব ঘাটতি, রাজকোষ ঘাটতি প্রভৃতি পূরণে এই সরকার কি কি পদক্ষেপ ও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। গত বছর (২০১৪-১৫ বাজেটে) এই সরকার রাজস্ব ঘাটতির প্রস্তাব করেছিল ৩৭৮৩৪৮ কোটি টাকা, এবারের বাজেটে (২০১৫-১৬) এই ঘাটতি ধরা হয়েছে ৩৯৪৪৭২ কোটি টাকা অর্থাৎ রাজস্ব ঘাটতি বাড়ানো হবে। কাদের স্বার্থে? সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া হয়েছে রাজকোষ ঘাটতিও বাড়বে। গত বছর এই ঘাটতির প্রস্তাব ছিল ৫৩১১৭ কোটি টাকা; এবার ধারা হয়েছে ৫৫৫৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছে রাজকোষ ঘাটতি বাড়বে।

এবারের বাজেটে সুযোগ পেয়েও বিজেপি সরকার কালো টাকা রোধের আইন GAAR (General Anti Avoidance Rule) আপাতত দু-বছরের জন্য স্থগিত করে দিল। মনে পড়ে ২০১২ সালে সংসদে এই আইন পেশ করে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারী (এফ আই আই)-দের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল। এরা ভারতীয় অর্থনীতিতে আজ যে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ এই আইনটি আজও কংগ্রেস কিংবা বিজেপি কোনো সরকারই পাশ করানো তো দূরের কথা, পেশ করার সাহসও দেখাতে পারছে না।

কেন হয় এই রাজকোষ ঘাটতি (fiscal deficit)? সোজা কথায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে হয় এই ঘাটতি। এর হাত থেকে বাঁচার একটি উপায় হল আয় বাড়ানো। আয় বাড়ে মূলত দু'টি উপায়ে, একটি হল শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যের উপর নানান ধরনের শুল্ক, কর, ট্যাক্স চাপিয়ে কিংবা বিদেশি পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক, কাস্টমস্ ডিউটি ইত্যাদি চাপিয়ে। আর একটি উপায় হলো জনগণের উপর আয়কর, বিক্রয় কর, সার্ভিস ট্যাক্স, সারচার্জ। সরকার আয় বাড়ানোর উপরোক্ত কোনো উপায়ই গ্রহণ করেনি। বিদেশি দ্রব্যের উপর কোনো রকম কর বা শুল্ক চাপায়নি। উল্টে কর্পোরেট ট্যাক্স (কোম্পানি কর) ৫ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্পদ কর তুলে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে রাজস্ব ক্ষতি বেড়েই চলেছে। এবারে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের মতে আনুমানিক ৫,৮৯,০০০ কোটি টাকা। গত বছর এই রাজস্ব ছাড় অর্থাৎ ক্ষতি ছিল ৫,৫৩,৯৯২ কোটি টাকা। কর্পোরেট ট্যাক্স ৫ শতাংশ কমিয়ে করা হয়েছে ২৫ শতাংশ কিন্তু যখন ৩০ শতাংশ ছিল এই ট্যাক্স তখনও কর্পোরেট হাউসগুলি নানান ছাড়ের ফাঁক দিয়ে ২৩ শতাংশের বেশি দিত না। বহু কোম্পানি সেটুকুও যাতে দিতে না হয় তার জন্য আদালতে মামলা করে দিত। যা অদৃশ্য কারণে বছরের পর বছর ঝুলে থাকত। এসব সত্ত্বেও এবারের বাজেটে সম্পদ কর পুরোপুরি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। যুক্তি হলো, এই কর তুলতে অনেক ঝামেলা। সেই যুক্তিতে জনগণের আয়ের উপর থেকে আয়কর তো তুলে দেওয়া হয় না? এই সম্পদ কর তুলে দেওয়ার ফলে সরকারের ২০১৩-১৪ সালের কর সংগ্রহের হিসাব

অনুযায়ী রাজস্ব ক্ষতি হবে ১০০৮ কোটি টাকা।

অনেকের ভাবনার বিষয় এই সরকারের কর্পোরেট প্রীতি। যদিও এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন যে তিনি মোটেই কর্পোরেট লবির লোক নন। তাহলে এবার দেখা যাক তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে কি কি স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন?

রাজকোষ ঘাটতি মেটানোর সহজ পথটি কংগ্রেসীদের মতো তিনিও গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস সরকারের মতো এই সরকারও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে রাজকোষ ঘাটতি মেটানোর পথ ধরেছে। এবারের বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে প্রাথমিক আয় ধরা হয়েছে ৬৯,৫০০ কোটি টাকা; কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে পুরোপুরি বিক্রি (strategic sale) করার মাধ্যমে মিলবে আরো ২৮,৫০০ কোটি টাকা, ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল গত বিজেপি-জোট সরকারের (এনডিএ) আমলে। সেবার হিন্দুস্থান জিঙ্ক ও বালকো-কে বেদান্ত গোষ্ঠীর হতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও কি বলতে হবে যে এই সরকার রাষ্ট্রীয় শিল্প ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি গড়ার কারিগর?' মুখে কিন্তু অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তিনি রুগ্ন শিল্প রক্ষা করবেন। আর লাভজনক শিল্পকে বিক্রি করবেন? কথাটা কিন্তু ঠাট্টা নয়! তিনি পুরোপুরি বিক্রি করার জন্য যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে সম্ভাব্য টার্গেট করেছেন সেগুলি সবই লাভজনক, যেমন— ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ভেল, ন্যালকো প্রভৃতি।

সরকারের রাজকোষের ঝুলি ভরানোর আর একটি সহজ পথ হলো এফডিআই। এটি কংগ্রেস ও বিজেপি— দুই সরকারেরই মনপসন্দ স্কিম। এফডিআই-এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ব্ল্যাক মানি ও হট মানি ভারতীয় দেশীয় কোম্পানিতে ঢুকেছে ও ঢুকছে। বাজপেয়ি সরকারের এক কাঠি উপরে মনমোহন সরকার আবার খুলে দিয়েছে আমাদের শেয়ার মার্কেট বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে। এদের বলে এফ আই আই (Foreign Institutional Investors)। এদের পুঁজির দাপটে সকলের অলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বহু দেশীয় কোম্পানি এদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ও ভারতীয় মুদ্রা মার্কেট আজ এরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই হঠাৎ-হঠাৎ-ই এরা ভারতীয় শেয়ার বাজারে ধস নামায়, কৃত্রিম ডলার সংকট সৃষ্টি করে টাকার বিনিময় মূল্যেও ধস নামায়। ভারতীয় কিছু কিছু কোম্পানি বা শিল্পে বিদেশি পুঁজির সীমা নির্দিষ্ট থাকায় এদের অগ্রগতি থমকে গিয়েছিল। এবার এদের সুবিধার্থে এফ ডি আই ও এফ আই আই-কে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছে এফ পি আই (Foreign Portfolio Investors)। একত্রীকরণের উদ্দেশ্য ভারতীয় কোম্পানিতে এদের পুঁজিবিনিয়োগের সীমাও বাড়ানো। ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অর্থসচিব এই বিদেশি পুঁজির দাপট বেড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বিরোধী হিসাবে বিজেপি কালো টাকা উদ্ধারের জন্য কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু এবারের বাজেটে সুযোগ পেয়েও বিজেপি সরকার কালো টাকা রোধের আইন GAAR (General Anti Avoidance Rule) আপাতত

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা-৪১।
৫. সম্পাদকের নাম : শ্রী বিজয় আঢ্য। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২৭/১, বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। ৬. **মালিকানা :** স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট। **ঠিকানা :** ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।

ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ :
শ্রী যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭।
শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫/২৪, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১।
শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা।
শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩।
শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর -৪।
শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা-৩২।
শ্রী অদ্বৈত চরণ দত্ত, ৯-এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা - ৬।
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা - ৪।

আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ১০.০৩.২০১৫

শ্রীরণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দু-বছরের জন্য স্থগিত করে দিল। মনে পড়ে ২০১২ সালে সংসদে এই আইন পেশ করে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারী (এফ আই আই)-দের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল। এরা ভারতীয় অর্থনীতিতে আজ যে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ এই আইনটি আজও কংগ্রেস কিংবা বিজেপি কোনো সরকারই পাশ করানো তো দূরের কথা, পেশ করার সাহসও দেখাতে পারছে না। সোনিয়া তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে বসাতে বাধ্য হয়েছিল। চিদাম্বরম অর্থমন্ত্রী হয়েই ২০১৬ সাল পর্যন্ত আইনটি শিকেয় তুলে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। এবার শুরু হলো অরুণ জেটলির পালা। বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীদের কালো টাকা রুখতে এই আইন আজও পাশ করানোর সাহস বিজেপি সরকার দেখাতে পারলো না। এদের ভরকেন্দ্র কোথায় নিহিত?

কালো বাজারিদের ছাড় দিলে কী হবে সাধারণ আয়কর দাতাদের বা প্রবীণ নাগরিকদের ছাড় দেওয়ার বদান্যতা তিনি দেখাতে পারেননি। উল্টে সার্ভিস ট্যাক্সের পরিমাণও বাড়িয়েছেন আবার। আরো নতুন নতুন পণ্যের উপর এটা চাপিয়েছেন, ক্লীন এনার্জি উৎপাদনের দায়ও জনগণের উপর চাপিয়েছেন। একদিন নয়া দিল্লীর পরিষ্কার রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে এবার তার দায়ও চাপিয়েছেন জনগণের উপর 'স্বচ্ছ ভারত সেস' রূপে। আপাতত কিছু কিছু সার্ভিসের উপর প্রয়োজন হলে এই সেস চাপানোর প্রস্তাব হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের কর্পোরেট-প্রীতির আরো একটি উদাহরণ দেশের সরকারি বন্দরগুলির কর্পোরেটাইজেসনের প্রস্তাব। সারা দেশে ১২টি বড় সরকারি বন্দর রয়েছে। এগুলি Major Ports Act, 1963 অনুযায়ী গঠিত; বোর্ড অফ ট্রাস্টিস দ্বারা এগুলি পরিচালিত। এন্নোরের (Enrore) কামারাজার পোর্টটি দেশের একমাত্র কোম্পানি অ্যাক্টে প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স্ দ্বারা পরিচালিত। এই সরকার চাইছে সবকটি পোর্টকেই কোম্পানি অ্যাক্টে কোম্পানিতে পরিণত করতে। এই পোর্টগুলির হাতে রয়েছে মোট ২-৬ লক্ষ একর জমি। সরকারের আসল লক্ষ্য এই জমি দখল করে রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া, যেটি এখন সরকারি জমি হওয়ায় সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে মৃত করে তোলার প্রক্রিয়া শুরুর প্রস্তাবও রয়েছে এই বাজেটে। পলি তোলার ভরতুকি (dredging subsidy) ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া এই প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

সরকারি সংস্থাগুলি কোম্পানিতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে এই সরকার ভারতীয় কোম্পানি দেউলিয়া করার পথ সহজ করার উদ্দেশ্যে একটি Comprehensisive Bankruptcy Code পেশ করা হয়েছে। বিদেশে যেমন যখন-তখন কোম্পানি লাটে তুলে কেটে পড়া যায়, ভারতে তা যায় না। এখানে Sick Industrial Companies Act (SICA) এবং Bureau for Industrial and Financial Reconstruction-এর মাধ্যমে কোম্পানি পুনরুজ্জীবনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই দু'টি আইনি মাধ্যম তুলে দিয়ে সরকার বিদেশি কোম্পানিগুলির স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে চায়, নয়া স্মার্টসিটি গড়ার নাম করে এগুলিতে International Finance Centre (IFC) বসিয়ে দেশের স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিগড়ে বাঁধতে চাইছে।

তবে একটিই আশার কথা এই সরকারের ডানা বাঁধা আছে রাজ্যসভায়। সাধে বলে 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন'।

(লেখক ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সভাপতি)

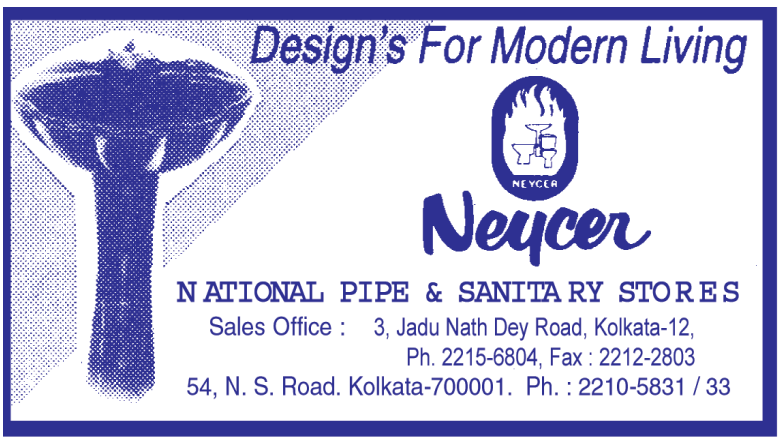

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

চিঠিপত্র

মাদারের স্বরূপ প্রকাশে হৈচৈ কেন?

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত মাদার টেরেসার সেবার আড়ালের পর্দা কেন ফাঁস করলেন তা নিয়ে সেকুলারবাদীদের পেট গরম হয়ে গিয়েছে। শ্রীভাগবত বলেছেন, মাদার টেরেসার গরিব মানুষদের সেবার আড়ালে আসল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। তিনি ভুল কিছু বলেননি। সারা দুনিয়া জানে মিশন অব চ্যারিটির উদ্দেশ্য কী? এরা শুধু ভারতেই নয়, বহু অ-খৃষ্টানদেশে ধর্মান্তরণের জন্য সমালোচিত হয়েছে।

বহু বিষয় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যার ফলে প্রমাণিত হয়েছে মাদার টেরিসার সংস্থা চ্যারিটি অব মিশন খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য ধর্মান্তরণে সরল বনবাসীদের উৎসাহিত করেছে। ভ্যাটিকান সিটি থেকে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরণের উদ্দেশ্যেই মাদারকে ভারতে পাঠানো হয়েছে। রণনীতি হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এবং বিবিসি পর্যন্ত দিনরাত মাদারের পক্ষে প্রচার করেছে। কোডাক কোম্পানি তার লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাদারের কাজের জন্য দান করার ঘোষণা করে।

বস্তিবাসী ও অনাথ শিশুদের মধ্যে মাদারের সেবাভাবী চিত্র তুলে ধরার জন্য বিবিসি একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। মাদারও গরিব ও অনাথ শিশুদের নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করতে বিবিসির সাহায্য নিয়েছিলেন। বিবিসি-ই প্রথম তাঁকে সন্ত ঘোষণার দাবি জানায়। মজার কথা, ওই তথ্যচিত্র নানারকম ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাসে ভরা ছিল। সেখানে দেখানো হয়েছে, অলৌকিক ক্ষমতায় মাদার মোনিকা নামে একটি মেয়ের ক্যানসার ভালো করে দিচ্ছেন। ২০১৩ সালে বৃটেনের ডেইলি মেইল সংবাদপত্রে প্রফেসর জর্জ লেরিভি ও জেনিভিয়েভ চেনার্ড নামে দুই গবেষক লিখেছিলেন যে, মাদারের সেবাকাজের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নিজেকে সন্ত প্রতিপন্ন করা। কিন্তু বিবিসি ওই তথ্যচিত্র প্রচারের পর খৃষ্টান দুনিয়া মাদারকে সন্ত ঘোষণার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

সে সময় দিল্লীতে খৃষ্টান সমর্থক সরকার ছিল। তাই এই ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাসের তারা বিরোধিতা করেনি। আজ যাঁরা শ্রীভাগবতের সত্য উদঘাটনের কথায় রে রে করে উঠেছেন তাঁরা সেদিন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। মালদা জেলার হবিবপুর, কেন্দপুকুর, বামনগোলা, গাজোল, পুরাতন মালদা, সামসী, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এলেই দেখতে পাওয়া যাবে মাদারের কীর্তির নমুনা।

—ঠাকুর সোরেন,
চাঁচোল, মালদা।

উদ্বাস্তুদের শঙ্কা ও ভাবনা

বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ড জানাজানি হওয়ার পর থেকে আমরা উদ্বাস্তুরা শঙ্কিত ও ভীত। একটা ভয় আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, আমরা কি আবার ঘর, বাড়ি, ভিটে ছাড়া হবো? আবার কি বোমা গ্রেনেড বিস্ফোরণে আমার প্রিয়জনের জীবন যাবে? আবার আমার কষ্টার্জিত সম্পত্তি লুঠ হবে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে? আবার একটা বীভৎস ভয়ঙ্কর দিনের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে! পশ্চিমবঙ্গ কি একটি কাশ্মীর তৈরি হবে? আমরা আবার আপনজনদের নিয়ে কোথায় যাব?

পূর্ববঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে হাসি মুখে জীবন দিয়েছিলেন, জেলে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার শেষ লগ্নে দেখা গেল এক শ্রেণীর লোকের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলা ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলে গেল। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের হায়নাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। তারপরের ভয়ঙ্কর ইতিহাস পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে শুধুমাত্র জীবন নিয়ে ভারতে এসে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করা। তারপর খাল পাড়ে, রেল স্টেশনে, রেল লাইনের ধারে, শিবিরে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটু একটু করে গত ৬৭ বছর ধরে যেটুকু আশ্রয়স্থল পেয়েছি তা আবার বোমা, গ্রেনেড ও বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

বর্ধমান কাণ্ডের পর পরিষ্কার হয়ে গেছে এই বিশাল অস্ত্র কারখানার নেপথ্যে উদ্দেশ্য কি? প্রতিদিনের সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল এবং গোয়েন্দাদের প্রকাশিত তথ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং ভারতবাসী জেনে গেছে ১৯৪৭ সালে যে ইসলামি বাংলার স্বপ্ন দেখেছিল সোরাবর্দী এবং তার দোসোরেরা, আজ তারা বৃহত্তর ইসলামি বাংলার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবাংলার পাকিস্তানপন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাই তাদের পরিকল্পনার শক্তি পরীক্ষার জন্য দেগঙ্গা, নলিয়াখালিতে, হিন্দু বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছে ও দাঙ্গা লাগাচ্ছে। তসলিমা নাসরিন এবং রুশদির মতো লেখকদের বিরুদ্ধে হিংস্র প্রতিবাদে সারা শহর জুড়ে নগ্ন সন্ত্রাস করছে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা পশ্চিমবাংলার মাটিতে ভারতীয় দোষরদের আখড়া তৈরি করছে।

তাই সমস্ত ভারতপ্রেমী পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে অকুণ্ঠ আবেদন, ইসলামি বাংলার স্বপ্নে বিভোর সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করে ভারতমাতার ভূমি থেকে উৎখাত করুন। আর এই ধর্মযজ্ঞে অগ্রণী সেনানী হওয়া উচিত সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতবাসীর। কারণ আমরা ঘর পোড়া গোরু, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত। আসুন, সবাই মিলে ইসলামি বাংলার ভারতীয় দোসরদের মূল উৎপাটন করি এবং ভারতমাতার পশ্চিমবঙ্গের মাটি রক্ষা করি।

—চন্দন কুমার,
পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

পেনশনভোগীরা বঞ্চিত

মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেন এ রাজ্যের প্রায় পাঁচ লক্ষ পেনশনভোগী। গত ৯ ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১ জানুয়ারি, '১৫ থেকে সাত শতাংশ হারে ডিএ ঘোষণা করেন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক প্রমুখ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্তরাও ডিএ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু নজিরবিহীন ভাবে এবারই সরকারিকর্মীরা ডিএ পেলেও অবসরপ্রাপ্তরা পাননি।

সত্যি বলতে কী, সরকারি কর্মীরা তাঁদের চাকরি জীবনে যে মাস মাইনে পান, পেনশনভোগীরা তাঁদের থেকে অনেক কম মাসিক পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা পান। আমরা জানি, পেনশনভোগীর একটা বড় অংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আবার তাঁদের অনেকেই অশক্ত, রোগ ভোগের শিকার। তাই চিকিৎসার জন্য তাঁদের প্রয়োজন একটা বড় অঙ্কের টাকা। এমনিতেই বাজারে আগুন। এমতাবস্থায় তাঁদের ঘোষিত ডিএ-র ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকার তাঁদের প্রাপ্য ডিএ থেকে বঞ্চিত করল।

খবরে প্রকাশ, রাজ্য সরকারের আর্থিক সংকট নাকি তীব্র। সামনে পুরসভার ভোট। তাই নাকি তাঁদের এই তুষ্টিকরণের প্রচেষ্টা। তবে মনে রাখতে হবে, এখনও কিন্তু ৪২ শতাংশ ডিএ রয়েছে পাওনা। তাঁরা কী ৭ শতাংশ ডিএ প্রাপ্তিতেই তুষ্ট থাকবেন? এই ডিএ প্রাপ্তিতে তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট নন। বকেয়া ডিএ না পেয়ে তাঁরা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন। তাছাড়া পুরভোটের সঙ্গে ডিএ প্রদানের সম্পর্ক কী? কারণ ডিএ পাওয়া তো সরকারি চাকরিজীবীদের সাংবিধানিক অধিকার! সরকার যদি মনে করে থাকে, সরকারি কর্মীদের তুষ্ট করতে পারলেই শাসকদল ভোট বৈতরণী পার হয়ে যাবে, তবে তারা ভুল করছে। কারণ সরকারি কর্মীরা ভোট কর্মী হলেও পেনশনভোগীরাও ভোটার। জয়-পরাজয়ের চাবিকাঠিটি কিন্তু তাঁদেরই হাতে। তাই পেনশন- ভোগীদের অবজ্ঞা করা সরকারের বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

'সুবর্ণরেখা'র কাহিনি বিজন ভট্টাচার্যের নয়

স্বস্তিকা পত্রিকায় 'লোকায়ত জীবনের নাট্যরূপকার — বিজন ভট্টাচার্য' (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) প্রতিবেদনে বিকাশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''প্রসঙ্গত গোত্রান্তর নাটকটি অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'সুবর্ণরেখা' ছায়াছবিটি গড়ে তোলেন'', বিকাশবাবুর দ্রুতলিখনে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে। সুবর্ণরেখা ছবিটিতে বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করলেও তাঁর অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না ছবি তৈরিতে। কাহিনি সম্বন্ধে যা স্পষ্ট বলা— তাতে বিজন ভট্টাচার্যের নাম নেই। 'গোত্রান্তর' নাটকের উল্লেখ নেই। ঋত্বিক ঘটক ঋণস্বীকারে কখনও কার্পণ্য করেননি। এক্ষেত্রেও ছিল না। কাহিনি বিজন ভট্টাচার্যের যখন নয় তাঁর নাম থাকবে কি করে? ছবিটির পরিচয়লিপিতে স্পষ্ট ঘোষণা— কাহিনি : রাধেশ্যাম । এই রাধেশ্যাম হলেন রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা। যতদূর জানা আছে, ঋত্বিক ঘটকের অনুরাগী রাধেশ্যাম বলেছিলেন, 'ঋত্বিকদা, এইসা কোই কাহানি হো তো ক্যায়সা হোগা?' সদাসৃজনমুখী ঋত্বিকের মনে ধরে রাধেশ্যামের মুখে শোনা কাহিনি। স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ঋত্বিক : 'স্টোরি অ্যাজ টোল্ড বাই রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা।' যদি 'গোত্রান্তর' নাটক অবলম্বনে ছবি হোত তাহলে কি ঋত্বিক অমন কথা লিখতেন?

'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল ১ অক্টোবর ১৯৬৫। ওই ছবিটি বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। কয়েকটি বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্র ওই বছরে মুক্তি পায়। মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম', তপন সিংহের 'অতিথি', সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', হরিসাধন দাশগুপ্তর 'একই অঙ্গে এত রূপ।' এছাড়া উৎপল দত্তের পরিচালনায় ছবি 'ঘুম ভাঙার গান।' বিজয় বসুর 'রাজা রামমোহন'। পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা হলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য পরিবেশনই বাঞ্ছনীয়।

—রমাপ্রসাদ দত্ত,
কলকাতা-৩।

বারাক ওবামার ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপদেশ প্রয়োজন

ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রশ্ন তুলে ভারতকে উপদেশ দেওয়া বারাক ওবামার নিজের দেশ আমেরিকায় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকার সিয়েটেল থেকে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দূরে বোথেলে এক হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর করা হয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরের দেওয়ালে আজেবাজে কথা লিখেছে। যে মন্দিরে তারা হামলা চালিয়েছে তা আমেরিকার বড় মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। আমেরিকান ফাউন্ডেশন কড়া ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করেছে। ওয়াশিংটনের হিন্দু মন্দির ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ন্যাস বোর্ডের অধ্যক্ষ নিত্যনিরঞ্জন বলেছেন, এর আগেও এই মন্দিরের দেওয়ালে দুষ্কৃতীরা রং ছুঁড়ে পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। আমেরিকায় বেশ কয়েক বছর থেকে হিন্দুমন্দিরগুলিকে নিশানা করা হয়েছে। গত বছর ভার্জিনিয়ার মোনেরোতেও হিন্দুমন্দিরে হামলা করা হয়েছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারতকে উপদেশ দেবার আগে নিজেরাই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপদেশ নিন।

—রামপ্রসাদ দাস,
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

কাছে থেকেও দূরে, আরো দূরে হবার পথে

শক্তিপীঠ দেবী বোদেশ্বরী

দেবব্রত চাকী

হিন্দু শাস্ত্রে সতীর একান্ন পীঠ একটি বহু চর্চিত বিষয়। শক্তিপীঠ হিসাবে খ্যাত এই দেবভূমিগুলি একেকটি তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ভারতীয় জনমানসে প্রতিভাত। যেমন কলকাতার কালীঘাট, বীরভূমের বক্রেশ্বর ও নলহাটি, অসমের কাম্যাখা, পাকিস্তানের বালুচিস্থান প্রদেশের হিংলাজ, মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী, বারানসীর মণিকর্ণিকা, গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের প্রভাস, ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী, নেপালের গণ্ডকী ইত্যাদি।

বোদেশ্বরী দেবীর মন্দির

আলোচ্য শক্তিপীঠগুলির এরকমই একটি শক্তিপীঠ হলো ত্রিস্রোতা, যেখানে দেবী ভ্রামরী অবস্থান করছেন। করতোয়া নদীতটে মা দেবী বোদেশ্বরী নামে পরিচিত। পীঠ নির্ণয় অনুসারে যা ষোড়শ মহাপীঠ নামে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত।

"ত্রিস্রোতায়াং বামপদে ভ্রামরী ভৈরবেশ্বর।"

ত্রিস্রোতায় দেবীর বামপদ পতিত হয়েছিল। এখানে দেবী হলেন ভ্রামরী এবং ভৈরব হলেন ঈশ্বর বা অম্বর। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে বলেছেন—

"তিরোতায় পড়ে বামপদ মনোহর
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অম্বর।।"

ত্রিস্রোতায় অবস্থান সম্পর্কে অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার বোদা থানার অন্তর্গত শালবাড়ি গ্রামে তিস্তা বা করতোয়া নদীর পাশে রয়েছে এই মহাপীঠ। ১৯৪৭ সালে যে পাঁচটি থানা জলপাইগুড়ি থেকে বিযুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম বোদা থানা। এখানে রয়েছে শালবাড়ি নামক গ্রাম এবং শালবাড়ি নামাঙ্কিত ছিটমহল। এ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, শালবাড়ি হচ্ছে একটি ভারতীয় ছিটমহল। সাবেক দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের যে সকল খণ্ড খণ্ড ভূ-ভাগ বৃটিশ শাসিত বঙ্গের অভ্যন্তরে ছিল তার অন্যতম ছিট শালবাড়ি। শালবাড়ি ছিটমহলে দেবী বোদেশ্বরী নামাঙ্কিত একটি মন্দিরের উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তা হলো,

পরম্পরা

বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনারের (অব) তত্ত্বাবধানে বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে— পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার উত্তর-পশ্চিমে ভিতরগড়, দুর্গনগরীর প্রায় ১০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে বোদেশ্বরী দুর্গনগরী অবস্থিত, যাকে স্থানীয়ভাবে ঠাকুরানী বলা হয়। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এর বাইরের প্রাচীর প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার (২ মাইল) এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২.৪ কিলোমিটার (প্রায় দেড় মাইল) প্রশস্ত। মাটির তৈরি দুর্গের প্রাচীর প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু। প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রায় ৯.০১ মিটার প্রশস্ত পরিখা। পরিখাগুলি বর্তমানে (১৯৬৮ খৃঃ) মজে গেলেও সেগুলির চিহ্ন বিদ্যমান।

বাইরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এলাকার ভিতর আরও একটি অভ্যন্তরীণ দুর্গ এলাকা আছে। বাইরের প্রাচীরের প্রায় ২০০ মিটার দূরে দূরে ভিতরের প্রাচীরগুলি নির্মিত এবং বাইরের দিকে সংলগ্ন পরিখা বাইরের পরিখার মতো হলেও আয়তনে অনেক ছোট। সমগ্র দুর্গ এলাকায় বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ দুর্গ এলাকায় প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়।

অবস্থা দেখে মনে হয় এখানে এককালে একটি দুর্গনগরী ছিল কিন্তু তা ছিল বহুকাল আগে এবং কালক্রমে সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে গেলেও মাটির প্রাচীর ও পরিখা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং সমগ্র এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ। পুকুরের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি প্রশস্ত স্থানে আছে। কোচবিহারের মহারাজা কর্তৃক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে নির্মিত একটি মন্দির। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ মন্দিরের আয়তন হবে প্রায় ১১ মিটার × ৫০ মিটার। বর্তমান মন্দিরের প্রায় ৫০ মিটার

দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তবে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ঢিবির মধ্যে প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখে মনে হয় যে, খুব সম্ভব এ ঢিবিকে কেন্দ্র করে একটি অতি প্রাচীন মন্দির এখানে ছিল এবং তা বহুকাল পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে কোচবিহারের মহারাজা কর্তৃক এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয় এবং সেই মন্দিরেও বারকয়েক সংস্কার কার্য করা হয়। স্থানীয় হিন্দুদের মতে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত দেবীর গোড়ালি এখানে পড়েছিল এবং সেকালে এ স্থান নাকি হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র একান্ন পীঠের এক পীঠ। দেবীর গোড়ালি বলে পরিচিত একটি ক্ষুদ্র বস্তু এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়ে আসছে। বর্তমান সময়কালে (১৯৬৮ খৃঃ) সমগ্র এলাকাজুড়ে আছে শালবন এবং এখানে কোনো জনবসতি নেই। দুর্গের চারদিকেও শালবনের অস্তিত্ব দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড. বুকানন হেমিলটন ১৮০৭/০৮ খৃষ্টাব্দে এস্থান পরিদর্শন করে এ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখেছেন তা হলো—

''The two chief places of worship among the Hindus are a thalched temple of Sib at Bhajonpure and a small brick temple of Bodeswari, a female destructive spirit from which the country derivs its name. It has considerable endowment from the Vihar family who has rebuilt it twice."

''There reamains no trace of the original building erected by a Buddah Raja for his faimily deity, but the temple situated in the centre of a fort where the Raja is said to have lived. It is a square of about 2 miles round and is swrounded by a wide ditch and high earthan rampart without towers or any other important military architecture."

একইভাবে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব আবুল কালাম মহম্মদ জাকারিয়া তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ''বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ''-এ উল্লেখ করেছেন যে— ''একান্ন বা বাহান্ন পীঠের এক পীঠ বলে বোদেশ্বরী'' মন্দিরকে পরিচিত করা হয়। বিষ্ণুচক্রে কর্তিত শিবের স্ত্রী সতীর দেহ একান্ন অংশে বিভক্ত হয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার সময় দেবীর কর্তিত গোড়ালি নাকি পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হয়। দেবীর পীঠকে কেন্দ্র করে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই মন্দির রক্ষার্থে দুর্গ নির্মিত হয় বলে প্রবল জনপ্রবাদ আছে। বিপদকালে কামরূপ কামতা রাজের পরিবার-পরিজন ও ধনরত্ন নাকি এই জঙ্গলময় দুর্গে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হোত।

তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে মীনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনামতে ধারণা করা হয় যে, তিব্বতের ব্যর্থ অভিযানের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি খুব সম্ভবত করতোয়া (মিনহাজ বর্ণিত বাগমতী) নদীর উত্তরে অবস্থিত এ দুর্গে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।"

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12

71, Park Street, Kolkata - 700 016

98311 85740, 98312 72657

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাংলাদেশের উত্তরীভাগের বিশিষ্ট গবেষক-অধ্যাপক ড. নাজমূল হক তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ''পঞ্চগড় : ইতিহাস, ও লোকঐতিহ্য''-তে বোদেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছেন তাহলো— ''বোদা থানার অন্তর্গত বোদেশ্বরী গ্রামে করতোয়া নদীর পূর্বতীরে বোদেশ্বরী মন্দিরটি অবস্থিত। এটি একটি দালান শ্রেণীর মন্দির। দূর থেকে দেখলে মসজিদ বলে ভ্রম হতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত 'জল্পেশ' মন্দিরের স্থাপত্য কৌশলের সঙ্গে রয়েছে এক ঘনিষ্ঠ সাদৃশ। বর্তমান মন্দিরগৃহটি কোম্পানী আমলে কোচবিহার মহারাজা কর্তৃক নির্মিত।

বোদেশ্বরী মন্দির আরো একটি কারণে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নিকট পবিত্র স্থান। বর্তমানে মন্দিরের ৫০ ফুট পূর্ব-দক্ষিণে একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেই মন্দির বর্তমানে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। দু-চারটি আস্ত ইট যা দেখা যায়, তাতে মনে হয় এ মন্দির ছিল অতি প্রাচীন। ওই মন্দির একান্ন পীঠের এক পীঠ বলে পরিচিত।

প্রশ্ন হলো এরকম একটি প্রাচীন ধর্মস্থান আমাদের ভূ-ভাগে অর্থাৎ উত্তর বাংলায় অবস্থান করলেও তা প্রায় রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই মন্দিরের প্রকৃত অবস্থান নিয়েও রয়েছে একরাশ ধ্বন্দ্ব। অনেকে অভিমত পোষণ করেন এই ধর্মস্থানের বেশ কিছু অংশ রয়েছে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে। শালবাড়ি নামক এই ভূ-খণ্ডটি একদা ছিল দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ছিটমহল, যা পরবর্তীতে ভারতীয় ছিটমহল হিসাবে পরিচিত। প্রতিবেশী বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত দেবোত্তর ভিতরগড় বোদেশ্বরী মৌজার সন্নিকটে অবস্থিত এই ভূ-খণ্ডের মধ্যে আরও একটি ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড রয়েছে যেটির নাম দেবোত্তর শালডাঙা। সরকারি মতে দেবোত্তর শালডাঙা একটি ভারতীয় ছিটমহলের মধ্যে বাংলাদেশি ছিটমহল। আমরা জানি দেববিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূমিখণ্ড দেবোত্তর বা দেবত্র সম্পত্তির হিসাবে পরিগণিত হোত প্রাচীন রাজন্যশাসিত কোচবিহার রাজ্যে। স্বভাবতই প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, কোচবিহারের মহারাজা যে মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন তার অবস্থান তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে ছিল, নাকি পার্শ্ববর্তী অবিভক্ত বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বোদা থানার অভ্যন্তরে ছিল? বিষয়টি নিঃসন্দেহে অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে এই মন্দিরের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন হিন্দুশাস্ত্র মতে পবিত্র তীর্থ সতীর একান্ন পীঠের এক পীঠ তিস্রোতা ওরফে দেবী বোদেশ্বরী মন্দির ভক্তপ্রাণ মানুষের জন্য সহজগম্য হওয়া প্রয়োজন।

আমরা জানি, ছিটমহল সমস্যা নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে টানাপোড়েন দীর্ঘদিনের। ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমা চুক্তির সূত্র ধরে ছিটমহল বিনিময়কেই উভয়দেশ সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে মান্যতা দিতে উদ্যত। যদিও পাশাপাশি বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিট বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশি হবার অপেক্ষা ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ ও বিশেষ ধরনের পরিচয়পত্রের সাহায্যে মূল ভূ-খণ্ডে অবাধে যাতায়াতে অধিক মাত্রায় আগ্রহী। কারণ ভারতীয় ছিটমহলগুলির প্রকৃত বাসিন্দারা সকলেই ছিলেন সাবেক দেশীয়রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার প্রজা। ১৯৪৯ সালে কোচবিহার রাজ্যের চূড়ান্ত ভারতভুক্তির মধ্যে দিয়ে তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ ও নাগরিক পরিষেবা পাবার অধিকারী। সেইসূত্র ধরে ভারতীয়ত্ব রক্ষার তাগিদে তারা চান তিনবিঘার মতো কড়িডর। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সদর থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ির সাতকুড়া এলাকার দৈখাতা সীমান্তের ওপারেই বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলা। এই পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার অভ্যন্তরে রয়েছে বেশকিছু ভারতীয় ছিটমহল। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অধীনস্থ এই সকল ছিটমহলগুলি হলো যথাক্রমে শালবাড়ি (১১৮৮.৯৩ একর), ছিট দৈখাতা (৪৪৯.২১ একর), নাজিরগঞ্জ (৪৩৪.২৯ একর), কাজলদিঘি ছিট (৭৭১.৪৪ একর), নটকটকা (১৬২.২৬ একর), বেউলাডাঙা (৮৬২.৪৬ একর) ইত্যাদি নামাঙ্কিত গ্রাম। এছাড়াও এই ছিটমহলগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-সংযক্তি (fragment) এই অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে।

কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে যেটা জানা যায়, ১৮৮৫ সালে তৎকালীন কোচবিহার নৃপতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর বৌদগার বিখ্যাত গোথিক ফ্রেসকো স্টাইলে নির্মিত সুপ্রাচীন বোদেশ্বরী মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে মন্দিরটিকে পুনঃসংস্কার করেন (সূত্র : প্রাচীন কোচবিহারের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত— স্বপন কুমার রায়, পৃষ্ঠা-২২৯)। এখন প্রশ্ন হলো— দ্বিজাতি তত্ত্বে দেশভাগ, র‍্যাড্‌ক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে জলপাইগুড়ি জেলার বিভাজন দেবী বোদেশ্বরীকে আপাতত আমাদের কাছে অধরা করে রেখেছে। এবারে কি ছিটমহল বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে ৫১ পীঠের একপীঠ বলে কথিত দেবী বোদেশ্বরী মন্দির চিরতরে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে? এই শক্তিপীঠকে ভারতীয় হিন্দু সমাজের কাছে সহজগম্য করতে তিনবিঘা কড়িডরের' আদলে 'আড়াইবিঘা' কড়িডর নির্মাণ করে ভারতীয় ছিটমহল নাজিরগঞ্জ, শালবাড়ি, দৈখাতাছিট, কালজদিঘি, নটকটকা, বেউলাডাঙাকে ভারতীয় মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো কি যায় না? দেশের 'জনগণমন অধিনায়কদের' কাছে একটাই প্রার্থনা ১৯৪৭ সালের স্থলসীমা চুক্তি নতুন করে পর্যালোচনা করুন। অন্ততঃ ছিটমহল অধ্যায়টি। মনে রাখা প্রয়োজন, মানচিত্র মুছবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও চিরতরে আমাদের থেকে হারিয়ে যাবে তা অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষই চান না।

সপ্তর্ষি ও তার গ্রাম

কৌশিক গুহ

সপ্তর্ষি দেখল একটা জায়গায় লেখা আছে, ‘মাতৃভূমির যথার্থরূপ গ্রামের মধ্যে। এখানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষ্মী এখানে তাঁর আসন স্থাপন করেন।’ পাথরে খোদাই করে লেখা। স্পষ্ট অক্ষরে। নিচে লেখা রবীন্দ্রনাথ। একটা বেদি। তার উপর মন্ত্রের মতো কথাগুলো বড় যত্নে রাখা। কোনো মূর্তি নেই। আর কোনো কথা নেই। পাশে রয়েছে বকুল গাছ। ঝরে পড়া বকুলের গন্ধ বেশ লাগছিল। সপ্তর্ষি তার রুমালে কিছু ফুল কুড়িয়ে নিলো। আশেপাশে কেউ নেই। কেউ নেই বলতে মানুষ দেখতে পেলো না। পাখিরা ডালে ডালে তাদের ভাষায় কথা বলছে অবিরাম। আবেগে যে আনন্দে। দূরে দেখতে পেলো মাঠে কাজ করছে কয়েকজন। খোলা মাঠে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বছরে দুবার ধান হয় এখন। আগে একবার হোত। মাঠের রূপ কিছুদিন অন্তর বদলে যায়। আগে লাঙল দিয়ে চাষ হোত। গোরু টানত লাঙল। এখন গ্রামে গোরু কম। হাল করার গোরু মেলে না। লাঙল কাঁধে মাঠে যাওয়ার লোক কমে গেছে। যন্ত্র এসে গেছে। ট্রাক্টর কেউ কেউ কিনেছে। ভাড়া দেয়। এছাড়া রয়েছে পাওয়ার টিলার। ধান ঝাড়ার জন্যে আগে পাটা ব্যবহার হোত। এখন ধান ঝাড়া মেশিন ঢুকে গেছে। খড় ধান আলাদা হচ্ছে। খাটুনি কম। কাজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি। ধান কাটার পর মাঠ থেকে মাথায় করে বয়ে আনতে হচ্ছে না। ট্রলিভ্যান বোঝাই করে চলে আসছে। ধানের গাদা আগের মতোই দেওয়া হচ্ছে। দেখে মনে হবে গোলা ঘর। সময় মতো ঝাড়ার ব্যবস্থা। বেশিরভাগ বাড়ির উঠোনে ধানের গাদা। ধান ঝাড়ার পর খড়ের গাদা। ঝাড়া ধান মেপে বস্তায় ভরে পৌঁছে যেত যার যার বাড়ি। যাদের গোলা ছিল তারা গোলায় তুলে রাখত। কারও থাকত ঘরের দুয়োরে কাঠের পাটার উপরে। কিংবা ঘরে চৌকির ওপরে। ইঁদুরের উৎপাত ছিলই। ইঁদুর যত না খেত তার থেকে বেশি নিয়ে পালাত। সপ্তর্ষি কোথায় যেন পড়েছিল, আমাদের দেশের শস্যের একটা বড় অংশ নষ্ট করে পোকামাকড় ইঁদুর আর পাখি।

সপ্তর্ষিকে দেখে থমকে দাঁড়াল নবকুমার সামন্ত। বয়েস কত হবে আন্দাজ করল। তা আশির কাছাকাছি হবে। বেশ শক্তসমর্থ। দেওয়ানতলার হাটে নিজের বাগানের চাষের কলা বেচে ফিরছিল। আগে গ্রামের লাইব্রেরিতে সাইকেল পিওন ছিল। কাজটা ছিল সাইকেলে ট্রে লাগিয়ে আশপাশের গ্রামে বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দেওয়া আর নিয়ে আসা। নবকুমার সাইকেল চালাতে পারত। তারপর একবার নদীর বাঁধে একটা ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে সাইকেল সমেত বাঁধ থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। বেশ চোট লেগেছিল। পা ভেঙেছিল। সুস্থ হবার পর কাজে যোগ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাইকেল চড়া বারণ হয়ে গিয়েছিল। সাইকেল পিওনের চাকরি যার, সে যদি সাইকেল চালিয়ে ঘুরতে না পারে তাহলে কি দাঁড়াবে? নবকুমার সাইকেলের বদলে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরবে ঠিক করেছিল। কদিন করল। কিন্তু সেটা কঠিন কাজ। হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘোরা সহজ ব্যাপার নয়। আর তা করতে গেলে সারাদিন চলে যায়। লাইব্রেরির অন্য কাজ হয় না। লাইব্রেরিয়ান অসিয়রঞ্জন দে কিছুদিন নিজে সে কাজ করলেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য কাজ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে বই দিলে লোকে খুশি হবে ঠিকই, কিন্তু লাইব্রেরিতে আরও বহুরকম কাজ রয়েছে, তা হবে কীভাবে? সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো : ‘বুক মোবাইল সারভিস বন্ধ থাকবে।’ অথচ ঠিক ছিল গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাইকেল পিওন বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দেবে। ঘোষণাটা এইরকম ছিল : ‘পাঠক যদি লাইব্রেরিতে আসতে না পারেন তাহলে লাইব্রেরি এগিয়ে যাবে পাঠকের কাছে। কেউ যেন ভুলেও বলতে না পারেন ওই বইটা আমি পেলাম না, অমুক বইটা আমার পড়া হলো না। সারা রাজ্যকে জালের মতো গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়ে ছেয়ে ফেলা হবে।’

ঘোষণা রূপ নিলো না নানান কারণে।

গ্রামের গ্রন্থাগার একসময় ছিল প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। আস্তে আস্তে তা বদলে গেলো। ঘর-দোর-বইপত্র থাকল। কিন্তু লাইব্রেরি সকলকে ডাক দিতে পারল না ঠিক ভাবে। বলতে পারল না রবীন্দ্রনাথের কথা অনুসরণ করে, ‘এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।’ পাঠকরা যাতে লাইব্রেরিতে না আসে তার ব্যবস্থাই হয়ে গেলো। সপ্তর্ষি শুনেছিল তাদের গ্রামে সকলের আগ্রহে উৎসাহে গড়ে উঠেছিল লাইব্রেরি। যা ছিল একসময় প্রাণবন্ত, তা হয়ে গেলো প্রাণহীন। গ্রামের মানুষরা কোনও আকর্ষণ পেলো না সেখানে। তারা গেলে মর্যাদা পায়নি কারও কাছে। লাইব্রেরিয়ান আর সাইকেল পিওন দায়সারাভাবে চাকরি করেছে। যারা লাইব্রেরিতে কাজ করবে তাদের বুঝতে হবে পেশাটা একটু অন্যরকম। বইকে পাঠককে লাইব্রেরিকে ভালোবাসতে হবে।

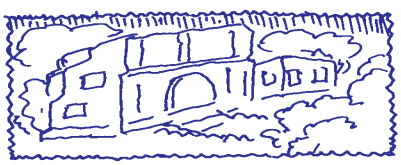

গোটা গ্রামটা সপ্তর্ষি একবার চক্কর দিল সাইকেলে চড়ে। গ্রামের মানুষের অবস্থা বদলেছে। সেই সঙ্গে মনটাও। শহরের বাজে জিনিসগুলো চটপট ঢুকে পড়ছে। ভালো জিনিসগুলো নয়। প্রত্যেকেই যেন নিজের চারপাশে গণ্ডী কেটে আলাদা করতে চায় নিজেকে। আগে বলা হোত গ্রামের মানুষদের সম্বন্ধে, ‘আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা।’ সপ্তর্ষি ভাবতে লাগল ‘এমনভাবে সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে নতুনভাবে গ্রাম উন্নয়নের কাজ কীভাবে হবে? উন্নয়নের সুফল সকলে চাইবে। কোনো দায়িত্ব আর দায়বদ্ধতা কি একেবারে থাকবে না?’ গ্রামের বাইরে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো খোদাই থাকলেও গ্রামের মানুষ বুঝতে চায়নি। কোথায় ফাঁক ছিল তাই ভাবছিল সপ্তর্ষি।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

মজার খেলা

চৌকো ঘরে সংখ্যা

অনেকক্ষণ পড়াশোনা করার পর একটু মজার অঙ্ক খেলা নিয়ে মেতে উঠল অনুষ্কা। সঙ্গে যোগ দিল বোন অন্বেষা। ওরা পর পর ঘর কাটল ষোলটা। তারপর একটু নিয়ম না মেনে ১ থেকে ১৬ সংখ্যা বসাল। এক একটা ঘরে একটা করে সংখ্যা। ছোটকাকু গানের রেওয়াজ করছিল। ওরা ডাকল, ‘গান থামিয়ে এসো।’ বলল, ‘প্রতিটি সারির যোগ হবে ৩৪। দুই কোণাকুনি যোগও হবে ৩৪। করো তো।’ ছোটকাকু একটু ভেবে ফাঁকা ১৬টা ঘরে ১৬টা সংখ্যা বসিয়ে বলল, ‘দ্যাখ ঠিক হয়েছে কিনা।’ এরকম বসানো হলো :

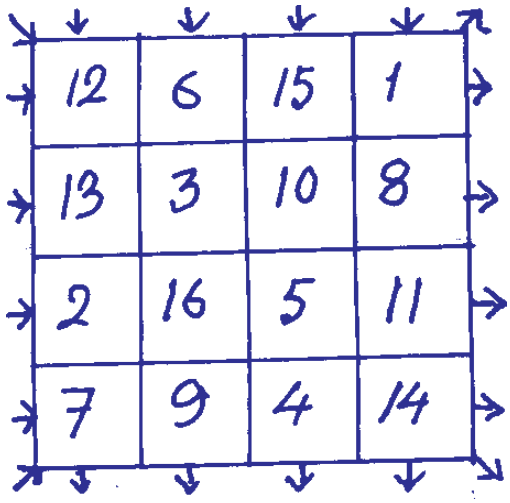

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. কতগুলি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ?

২. ভারতের একমাত্র জীবিত আগ্নেয়গিরি কোথায়?

৩. কটি দ্বীপে জনবসতি আছে? আন্দামানে কত? নিকোবরে কত?

৪. কোন্ সাল থেকে আন্দামান কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল?

৫. পানীয় জলের ব্যবস্থা কীভাবে হয় পোর্টব্লেয়ারে?

উত্তর : ১. ৫৭২টি দ্বীপ। ২. পোর্টব্লেয়ার থেকে ১৩৫ কিলোমিটার দূরে ব্যারেন আইল্যান্ড। ৩. ৩৬টি। আন্দামানে ২৪টি। নিকোবরে ১২টি। ৪. ১৯৫৬ সাল থেকে। ৫. বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে।

ফিরে পড়া

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;
ফণিমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা-দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী-মাঠ-ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

‘ভ্যালেন্টাইন ডে’
মেকলের উদ্দেশ্যের সার্থক রূপায়ণ

আঁখি মহাদানী মিশ্র

শিরোনাম দেখে অনেকেই অবাক হবেন। কবেকার সেই ভ্যালেন্টাইন, প্রায় ১৮০ বছর আগের মেকলে সাহেব আর আজকের ভারতীয় সমাজ? ভাবতে অবাক লাগলেও এগুলি একইসূত্রে বাঁধা।

যে কোনো সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের অবদমিত যৌন চাহিদার নগ্ন প্রদর্শনকে কখনই সমর্থন করেন না। আমাদের দেশ সীতা-সাবিত্রীর দেশ, নানক-শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দেশ, সেই দেশে ভালোবাসার প্রকাশ্য প্রদর্শনের একটা দিন উদ্‌যাপন করা, আমাদের পরম্পরার মধ্যে পড়ে না।

গণমাধ্যম এবং বাজার ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’-কে বাজারিকরণের জন্য ব্যস্ত। ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’-র সমর্থকরা তাদের বিরোধীদের ‘ভিলেন’ রূপে দেখানোর চেষ্টা করে এবং গণমাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়া তাদের এই কাজে প্রভূত সাহায্য করে। লাভগুরুর মাধ্যমে যৌনতা ও নগ্ন ফ্যাশনকে বিক্রি করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৫ সালে ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’ উপলক্ষে ভারতে বাজার ১১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই বিক্রির বর্ধিত হার বাৎসরিক ২০ শতাংশ।

বর্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই যুবক। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে এই যৌনতাই যেন আজ সমাজের নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিবারগুলি আজ ভাঙছে। বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পুরুষ-নারী একাধিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে এই বিষয়গুলি পশ্চিমি দেশের কাছে একটি উদ্বেগের বিষয়। আমরা এটুকু ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারি যে, ভারতে এই হার খুবই কম। এখানে এখনও বিবাহকে পবিত্র বন্ধন হিসাবেই দেখা হয়। তথ্য অনুসারে, সুইডেন এবং আমেরিকাতে প্রতি এক হাজার ৫৪.৫টি বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এই বৃটেনে ৪২.৬, ফ্রান্সে ৩৯.৪, জার্মানিতে ৩৮.৩, কানাডাতে ৩৭, কিন্তু আমাদের প্রিয় দেশ ভারতবর্ষে ১.১।

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ভারতে আসেননি,

তাঁর ভারতে আসতে ১৫০ বছরের বেশি সময় লেগেছে। মেকলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আজ প্রচেষ্টার অভাব নেই। আগামী ১০০ বছরে ভ্যালেন্টাইন যদি ভারতীয় যুবসমাজের কাছে ‘আইডিয়াল হিরো’ রূপে প্রতিভাত হয়, তাহলেও অবাক হবার কিছু নেই। মেকলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে যেটুকু বাকি, তা বোধহয় ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখটাই করে দেবে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বর্তমান ভারতীয় যারা পশ্চিমি চিন্তাভাবনার অন্ধ সমর্থক তারা মনে করে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মেকলে সাহেবের অবদান। ১৮৩৫ সালে মেকলে সাহেব একটি ‘মেমো’ প্রকাশ করেন, যেটি তাঁর উদ্দেশ্যকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে। মেকলে এমন ভারতীয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন যারা দেখতে ভারতীয় হবে, কিন্তু চিন্তা-ভাবনায়, পছন্দে-অপছন্দে অর্থাৎ সবদিক থেকে বৃটিশদেরও হার মানাবে। বাবাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, “I am trying to develop such a system that will produce 'Black- English-man'. These people will feel proud in deviding their own culture. This will destroy Indian culture. Even if we have to leave India in certain circumstances those 'Black Englishmen' will continue serving our purpose.”

মেকলে তাঁর উদ্দেশ্যে সফল এবং আমরা নিজেরা আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত। আজ ভারত দু’ ভাগে বিভক্ত। একশ্রেণী পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত এবং আরেকশ্রেণী শাশ্বত ভারত ও তার বাণী থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত। প্রথম শ্রেণীর সমর্থকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের গোঁড়া, সঙ্কীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত করে। নানক, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, মীরা, বিবেকানন্দের মতো মনীষীর অবদান ভুলে ভ্যালেন্টাইনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখাতে তারা ব্যস্ত।

তবে আশার আলোও আছে। আজও বহুসংখ্যক মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বিশ্বাস করে। যে কোনো মূল্যে আমাদের জাতীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করা উচিত, আর এটি কোনো উগ্রপথে করা যাবে না। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের মেকলের থেকেও বড় পরিধিতে কাজ করতে হবে। আমরা মেয়েরাই এই কাজে সবথেকে অগ্রণী হতে পারি। জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত, যে সময়টি শিশুর চরিত্র গঠনের পক্ষে উপযুক্ত, সেই সময়ের বেশির ভাগটাই শিশু তার মায়ের সঙ্গে অতিবাহিত করে। কাজেই আমরা মায়েরা যদি আমাদের সন্তানদের অন্ধ পশ্চিমি অনুকরণ না করতে শিখিয়ে চিরন্তন, শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করতে পারি, তবে একাজ খুব সহজেই সম্ভব হবে। ■

পরিবর্তিত জমানায় অনৈতিক সিদ্ধান্তের কড়া মূল্য চোকালেন গৃহসচিব অনিল গোস্বামী

অতিথি কলম

আর কে রাঘবন

গত ২০১৪ সালের মে মাসে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তনের হাত ধরে প্রশাসনিক স্তরে যে হৃত মূল্যবোধ ও স্বচ্ছতা পুনরুত্থান শুরু হয়েছে তার সঠিক আন্দাজ হয়তো পাননি ইউপিএ জমানায় উচ্চ পদে কাজ করা গৃহসচিব অনিল গোস্বামী। কারণটি একটু পুরানো হলেও এর তীব্রতা বা যুগান্তকারী অভিঘাত অবশ্যই কেন্দ্রীয় আমলা ও তাবৎ প্রশাসনিক মহলে এক সদর্থক চলার বার্তা পাঠিয়েছে। অনেকেই জানেন সারদা মামলায়

> এই বেনজির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দিল্লী তথা ভারতের সমগ্র কেন্দ্রীয় আমলাবাহিনীর কাছে একটি সোচ্চার বার্তা চলে গেছে যে তাদের পদ ব্যবহার করে অসাধু কাজকর্মে প্রশ্রয় দিলে আখেরে পস্তাতে হবে। মুখ শোঁকাশুকির দিন শেষ।

সরকার সমন পাঠানো সত্ত্বেও ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাতঙ্গ সিং দিল্লীর ক্ষমতা বলয়ের ভরসায় সিবিআই-এর তলবকে নানা অছিলায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে চলছিলেন। অবশেষে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি কৃপা করে সিবিআই দপ্তরে আসার পর তাঁকে সেখানে দীর্ঘ জেরা করা হয়। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করার তোড়জোড় শুরু হয়। এদেশে দীর্ঘদিন বলবৎ থাকা ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সিবিআই দপ্তরে যোগাযোগ ও অসৎ উদ্দেশে তাকে ব্যবহার করার যে অলিখিত রেওয়াজ চালু আছে তারই চিরাচরিত প্রয়োগের অপচেষ্টা করা হয়। নাটকের এখানেই শুরু।

অভিযুক্ত আসামি মাতঙ্গ সিং-এর পক্ষে গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘদিনের দোসর গৃহমন্ত্রীকে ফোন করে শীঘ্র ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। ইউপিএ-২ সরকারের পতনের পরও এই মাতঙ্গ দীর্ঘদিন দিল্লীর অলিন্দে বেশকিছু বসে থাকা আমলার মাধ্যমে তার প্রভাব ধরে রেখেছিলেন। সেই সুবাদেই তাঁর ফোন করা। এরপরই বরাবরের মতো (এ ব্যবস্থা অন্যান্য অনেক গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেই পূর্বে অনুসৃত হোত) গৃহ সচিব বেশ কিছু হোমরা-চোমরা সিবিআই কর্তাদের সঙ্গে দিল্লীতে বন্ধু মাতঙ্গের গ্রেপ্তার এড়ানো নিয়ে কথা বলেন। অবশ্য সরাসরি সিবিআই ডাইরেক্টর-এর সঙ্গে কথা বলেননি তিনি। দেশের গৃহমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাজকর্মের কিছু আন্দাজ হয়তো ওই সিবিআই আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে সিবিআই অধিকর্তার কানে তুলে দেন। সিবিআই ডাইরেক্টর কালক্ষেপ না করে ঘটনাটি সরাসরি গৃহমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনেন। তারপরের ঘটনা সকলেই জানেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গৃহসচিবের পদ চলে যায়। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গত কয়েক দশকের কলুষিত সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেন্দ্রে স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী।

দিল্লীর দরবারে একটা ব্যাপার নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল এখনও ধন্দে রয়েছে তা হলো অনিল গোস্বামী নিজের তাগিদেই মাতঙ্গের জন্য এতদূর গিয়েছিলেন না কয়েক মাস আগে ক্ষমতা হারানো কায়েমি স্বার্থভোগীদের কেউ কেউ এখনও সক্রিয়তা দেখিয়ে তাঁকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। অবশ্য অনিলবাবুর ব্যাপারে সিবিআই ব্যাপক ফোন কল রেকর্ড ও অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধার করে তবেই গৃহমন্ত্রীর দপ্তরে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছিল। তবে এই ঘটনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন পরে একজন সর্বোচ্চ পদাধিকারীর ক্ষেত্রে তাঁর পদমর্যাদার এমন নগ্ন অপব্যবহার ও সমগ্র ব্যবস্থাটিকে কলুষিত করার দীর্ঘদিনের কর্মপদ্ধতি সরাসরি সামনে এল।

মনে রাখতে হবে মাতঙ্গের বিরুদ্ধে

অভিযোগগুলি মোটেই ছোটখাটো নয়। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও পক্ষান্তরে গরীব মানুষের বিপুল অর্থ আত্মস্যাৎ করার অভিযোগের তদন্ত চলছে। এ ক্ষেত্রে সিবিআই যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করছিল তার কৈফিয়ত তাদের কেবলমাত্র আদালতের কাছে দেওয়ার কথা। কোনো প্রশাসনিক কর্তা বা কারুরই এতে নাক গলানোর অধিকার নেই। আজ একথা সগর্বে বলা দরকার দেশের নির্বাচিত সরকার মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে পদের অযোগ্য এক ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে সমগ্র দেশবাসীর কাছে সর্বোচ্চ সদিচ্ছার প্রমাণ রেখেছে।

শুধু তাই নয়, এই বেনজির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দিল্লী তথা ভারতের সমগ্র কেন্দ্রীয় আমলাবাহিনীর কাছে একটি সোচ্চার বার্তা চলে গেছে যে তাদের পদ ব্যবহার করে অসাধু কাজকর্মে প্রশ্রয় দিলে আখেরে পস্তাতে হবে। মুখ শোঁকাশুকির দিন শেষ। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অতীতের রীতি মেনে যেমন এসব অনাচার চেপে যাওয়া হোত বর্তমান সিবিআই নিদের্শক সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে দেওয়ার সাহস দেখালেন। তাঁর নীতিবিশিষ্টতার যোগ্য প্রত্যুত্তরও তিনি হাতেনাতে পেলেন দেশের গৃহ ও প্রধানমন্ত্রীর যুগপৎ যোগ্য সমর্থনে। দেশের নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ ও ভ্রষ্টাচার নির্মূল করতে এই ঘটনা চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলবে বলেই আমার ধারণা।

অনেকে হয়ত জানেন না দেশের গৃহসচিব একজন পর্যাপ্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। দেশের সমস্ত প্রবীণ পুলিশ আধিকারিকের যাবতীয় পদোন্নতি-অবনতি তাঁর কলমের খোঁচায় নির্ভরশীল। বহু অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিককেই তাঁর কাছে সাধারণ সুবিধে নিতে গেলেও নতজানু হতে হয়।

অবশ্যই অতীতে যেমন অনেক কর্তব্যনিষ্ঠ ও আদর্শবান আধিকারিক এই পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন, তেমনি কিছু কুলাঙ্গারের দেখাও যে পাওয়া যায়নি তা নয়। যারা শুধুমাত্র ক্ষমতা অপব্যবহারের সুবাদে অসাধু পুলিশ অফিসারদের স্বার্থই রক্ষা করে এসেছে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা নির্দ্বিধায় বহু আদর্শবান অফিসারের চাকরিজীবন নষ্ট করে দিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কী সিবিআই-এর ক্ষেত্রে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও খুব সুখকর নয়। আমার কর্মজীবনে এমন লোকের সংস্পর্শেও আসতে হয়েছে যাঁর স্পর্ধা এতদূর গিয়েছিল যে তিনি স্বয়ং গৃহমন্ত্রী সিবিআই-কে যে পরিকাঠামোগত সাপোর্ট অনুমোদন করেছিলেন তাকেও অবজ্ঞা করেন। আমার মনে হয়েছিল সিবিআই দপ্তরের সঙ্গে তাঁর যেন ব্যক্তিগত দুশমনি ছিল। না হলে সিবিআই-এর যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল তিনি বরাবর তাকে অস্বীকার করে দপ্তরের ক্ষতিসাধন করে গেছেন। আজ ঠিক সেই সময়ই এসেছে যখন একজন কড়া ধাতের গৃহমন্ত্রী তাঁর গৃহসচিবকে তীক্ষ্ণ নজরদারিতে রাখছেন। প্রয়োজনে কঠিনতম ব্যবস্থা নিতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন। আরও একটা কথা হয়ত সকলের জানবার নয় যে সিবিআই কাজ করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে থাকা পার্সোনেল ও ট্রেনিং বিভাগের আওতায়। তাই গৃহমন্ত্রক মূলত তদারককারীর ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রক দেশের নানা রাজ্যের অধীনস্থ ক্যাডারদের থেকে পুলিশ আধিকারিকদের বেছে সিবিআই-এ নিয়োগ করে। এটি ছাড়া দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে গৃহ মন্ত্রকের সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। সিবিআই-এর ওপর কর্তৃত্বও নেই। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ বিশেষ অপরাধমূলক মামলা কেন্দ্রের কছে পাঠানো হলে গৃহমন্ত্রক কোন্‌টি সি বি আই দেখবে, কোনটি এন আই এ (National Investigative Agency) দেখবে তা ঠিক করে দেয়।

সিবিআই-এর প্রশাসনিক অধিকর্তা আগে বলা দেশের প্রধানমন্ত্রী, হ্যাঁ শুধু প্রধানমন্ত্রীই আর কেউ নয়। সিবিআই-কে খানিকটা অসম্মানজনকভাবেই গৃহমন্ত্রক থেকে আলাদা করে দেওয়ার এই কাজটি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এর উদ্দেশ্যই ছিল অন্য যে কোনো মন্ত্রী বা আমলার সিবিআই পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সিবিআই-কে মুক্ত রাখা। অবশ্য বাধ্যতামূলক না হলেও দেশের প্রশাসনের তালমিল ঠিক রাখতে সিবিআই অধিকর্তা অনেক সময় দেশের নানান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা তদন্তের গতি-প্রকৃতি গৃহমন্ত্রীর নজরে এনে থাকেন।

আবার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অনিল গোস্বামীর পর্ব সিবিআই-এর হাত বিপুলভাবে শক্ত করবে। ভবিষ্যতে কোনো শক্তিমানই যে প্রভাব খাটিয়ে তদন্তের অভিমুখ পালটে দেবে এমনটা ঘটা খুব সহজ নয়। তবে এর একটি নেতিবাচক দিকও আছে। সিবিআই-কেও খুবই সমঝে চলতে হবে। বিপুল ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ও তদন্ত প্রক্রিয়া চালাবার সময় সিবিআই আধিকারিকরা যেন কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে বসেন। নিরপরাধী যেন হয়রান না হয়। এর ফলে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি পরে নিরপরাধ প্রমাণ হলে তাঁর সম্মান পুনরুদ্ধার হলেও হতমান ও কালিমালিপ্ত হবে সিবিআই। মনে রাখতে হবে সিবিআই-এর সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখনও নেতৃত্বের সঙ্কট রয়েছে। তাদের দু'জন পূর্বতন অধিকর্তা এখনও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হয়ে আসতে পারেননি।

বর্তমান সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে তাও এখন অজানা। একটা কথা শেষে বলব। প্রবাদের ''সিজারের স্ত্রীকে'' যেমন সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়, সিবিআই-এর ক্ষেত্রেও সে আশাই পোষণ করে দেশের মানুষ। সিবিআই-কে নিজেই তার উচ্চ মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। কেননা সিবিআই অসৎ, অসজ্জন ব্যক্তি বা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে হাত মেলালে শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের ওপর অগাধ আস্থা রাখা দেশের সাধারণ মানুষ। আশা রাখি, সিবিআই তা হতে দেবে না।

(লেখক সিবিআই-এর ভূতপূর্ব অধিকর্তা)

কেন্দ্রীয় বাজেট

বৃহৎ লক্ষ্যের সূচনা

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

এবারের বাজেট ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দু'টি বিষয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। এক) বাজেট সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু করল সরকার। দুই) উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের সম্পর্ক সহযোগিতায় বদলে দেবার প্রচেষ্টা আরও একধাপ এগোলো বলে মনে হল। এবার থেকে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে প্রকল্প ঘোষণার বদলে রাজ্যের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্যকে অনেকবেশি ক্ষমতা আর স্বাধীনতা দিতে চায়...

বলিষ্ঠ, উন্নত ভারত গড়ার ইস্তেহারকে সামনে রেখে বিজেপি এবার ক্ষমতায় এসেছে। গতানুগতিক পথে হেঁটে এটা সম্ভব নয়, বরং প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে যে একটা আমূল পরিবর্তন দরকার সেকথা আজ প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এটা করতে যাওয়াটা যে বাস্তবে কতটা কঠিন, তা এ সরকার কয়েকমাসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। স্বভাবতই, একটা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে সরকার অত্যন্ত মেপেজোকে পা ফেলতে চায়, ঠিক যেমনটি করে থাকেন ম্যারাথন দৌড়ের বিজয়ীরা।

বাজেটে গরিবদের জন্য বিশেষ করে গ্রামের গরিবদের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয়বরাদ্দ করা একটা প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু কেবল গ্রামের মানুষই নয়, কোথায় কত টাকা যাচ্ছে জানেন না স্বয়ং পণ্ডিতরাও। গ্রামে রাস্তাঘাট বা বিদ্যুতের জন্য কোথায় কত প্রকল্প রয়েছে, কে খরচ করছে, কাকে হিসেব পাঠাচ্ছে তার খেঁই পাচ্ছেন না অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা। এক একটি বিষয়ে একশোরও বেশি প্রকল্প রয়েছে। অনেকগুলিরই হিসাব পাওয়া যায় না। খাদ্য সুরক্ষার নামে ঢালাও কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। বাস্তবে প্রকল্পের খাদ্যশস্যের বেশিরভাগটাই গরিবের হাতে না গিয়ে চোরাপাচার হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকাঠামো বৃদ্ধির হার একেবারেই আশাপ্রদ নয়; রয়েছে অজস্র দুর্নীতির অভিযোগ। এরাজ্যের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, গত অর্থবর্ষে ১৭টি জেলা পরিষদ গড়ে বরাদ্দের ৭২ শতাংশ খরচ করতে পেরেছে। ৯টি জেলা ৩০ শতাংশেরও বেশি টাকা সারা বছর ফেলে রাখছে, এক একটি জেলায় যা কমবেশি ১০০ থেকে ১২০ কোটি টাকা। অথচ সমৃদ্ধির সুফল সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া কতদূর চুঁইয়ে গরিবের ঘরে পৌঁছবে সে নিয়ে অর্থনীতিকরা যথেষ্ট সন্দিহান। কেননা, এর সুফল পেতে গেলে গরিবকে প্রথমে বাজার অর্থনীতির অনুসরণ করতে হবে এবং সেই কারণে ইউ পি এ জমানায় আইন করে খাবার, কাজ এসব পাইয়ে দেবার প্রথা থেকে বের করে এনে গরিবদের আর্থিকভাবে সবল করার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে তাঁদের সক্ষম করতে চায় এই সরকার। সরাসরি ভর্তুকি বা বাজার অর্থনীতির পথে না হেঁটে, এই দুয়ের সমন্বয়ে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় বর্তমান সরকার। যাতে একদিকে পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে আর্থিক বৃদ্ধির পথে এগোনো যাবে, আবার সরাসরি আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে গরিবদের কাছে বৃদ্ধির সুফল পৌঁছানো সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা প্রমাণ করে যে, সরকার কত পরিকল্পিত উপায়ে এপথে এগোতে চলেছে।

এতকাল ধরে বাজেটের ধারণাটি ছিল মূলত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য আলাদা করে সুবিধা ঘোষণা করা। সামগ্রিকভাবে দেশের কথা খুব কমই ভাবা হয়। এবার অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করলেন সেখানে কারও মনরক্ষা করার চেষ্টা চোখে পড়েনি। বরং সবদিক দিয়ে অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। মূলত যে দু'টি ভাবনা নিয়ে এবারের বাজেট বানানো হয়েছে তা হলো— এক) মানুষকে সরাসরি পাইয়ে দেবার বদলে পরিকাঠামো নির্মাণ করে আর্থিক বৃদ্ধির পথ সুগম করা, যার সুফল সমাজের সর্বস্তরে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছাবে। দুই) গরিবের জন্য পুরনো প্রকল্পগুলিতে ব্যয়বরাদ্দ না বাড়িয়ে বরং তাদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে কিছু নতুন প্রকল্প ভাবা। অর্থমন্ত্রী মনে করেন যে, দেশের পরিকাঠামো যেভাবে পিছিয়ে আছে তা দিয়ে কখনোই অভিষ্ট আর্থিক বিকাশ সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে পরিকাঠামোয় ৭০ হাজার কোটি টাকা লগ্নি বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। নতুন রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণে ভালোরকম ব্যয়বরাদ্দের পাশাপাশি 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সঞ্চয় যোজনা'র মাধ্যমে কৃষকরা যাতে সেচের কাজে পূর্ণ সহায়তা

পান তাও নিশ্চিত করেছেন। দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণ ও স্বল্পমেয়াদি কৃষি সমবায় ঋণসহ ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিঋণ দেওয়া হবে আগামী অর্থবর্ষে। জাতীয় কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাও চালু হতে চলেছে। রেল, রাস্তা ও সেচের প্রকল্পে অর্থের যোগান সুনিশ্চিত করতে করমুক্ত পরিকাঠামো বন্ডকে সরকার ফিরিয়ে এনেছে। সম্পদ-কর তুলে দিয়ে এবং শিল্পে কোম্পানি করের বোঝা কমিয়ে বড় শিল্পে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দিলেও সরকার উন্নয়নের রাশ কর্পোরেটের হাতে তুলে দেয়নি। সরকার মনে করে যে, উপযুক্ত পরিকাঠামোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যবসা বাড়লে একদিকে যেমন অর্থনীতির প্রকৃত উন্নয়ন হবে, তেমনি খুলবে কর্মসংস্থানের পথও। এরকম শিল্পে আরও বেশি ঋণের যোগান দিতে ২০ হাজার কোটি টাকায় 'মুদ্রা ব্যাঙ্ক' খোলা হবে। এর থেকে উপকৃত হবে প্রায় ৫ কোটি ক্ষুদ্রশিল্প। শিল্পে সহজে ছাড়পত্র দেবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে বিভিন্ন ছাড়পত্র জোগাড়ের প্রক্রিয়াকে এক ছাতার তলায় আনার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে লাভজনক করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ যেমন লক্ষণীয়ভাবে বাড়ানো হয়েছে, তেমনি রুগ্ন সংস্থাকে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়কেও কমিয়ে আনতে চলেছে সরকার। অলাভজনক সংস্থার বিলগ্নীকরণের পাশাপাশি কিছু লাভজনক সংস্থার শেয়ার বেচে আগামী অর্থবর্ষে বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণের বেশি করা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ বাড়াতে ১০০০ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। সোনা আমদানি কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে সোনার আমদানি শুল্ক যেমন কমানো হয়নি, তেমনি সোনার যোগান বাড়াতে মানুষের কাছে যে সোনা মজুত আছে তা ব্যাঙ্কে রাখার জন্য উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাঙ্কে সোনা জমা দিয়ে গোল্ড বন্ড কিনলে আমানতকারি সুদ আয় করতে পারবেন, আবার ব্যাঙ্কও ওই সোনা ধার দিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সুদ আয় করতে পারবে। সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করতে চাইছেন। ভারতীয় সংস্থাগুলি যাতে বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে বিদেশেও রপ্তানি করতে পারে, তার জন্য অর্থমন্ত্রী প্রতিরক্ষা খাতে প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ করেছেন। এতে শুধু যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বিপুল খরচ কমানো যাবে তাই নয়, এই শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বর্তমানে কর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র।

সে কারণে এই শিল্পকে বিশ্বমানের করে তোলার লক্ষ্যে ভালোরকম বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ৫টি আলট্রা মেগাপাওয়ার প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে আপাতত ৫টি রাজ্যে এইমস্ হাসপাতাল তৈরি করা হবে। আগামী তিন বছরে রাজকোষের ঘাটতি জাতীয় আয়ের ৩ শতাংশে নামিয়ে আনতে চান সরকার। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানোর বাস্তবতা মেনে নিলেও অর্থমন্ত্রী রাজকোষের ঘাটতি লাগামছাড়া হতে দেননি। কেননা, রাজকোষের ঘাটতি যে শুধু অর্থনীতির দুর্বল স্বাস্থ্যের দিকটাকে নির্দেশ করে তাই নয়, এতে মূল্যবৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হয়।

সুরক্ষার প্রশ্নে সীমান্তে সড়ক তৈরির জন্য সরকার ব্যয়বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছে। চীন, পাকিস্তান, ভুটান, মায়ানমার প্রভৃতি সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে এবং অনুপ্রবেশ রুখতে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র বসিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নেও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালোটাকা ফেরানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে আর কালো টাকা বিদেশে না যায়, তার জন্য কঠোর আইন আনতে চলেছে সরকার। কেননা, যথাযথ আইন করে কালোটাকার লেনদেন না আটকাতে পারলে দারিদ্র্য ও অসাম্য রোখা যাবে না বলে মনে করছে সরকার।

গরিব এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষের জন্য বিশেষ ভাবনা রয়েছে এই বাজেটে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমার মাধ্যমে বছরে মাত্র ১২ টাকার বিনিময়ে ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা পাওয়া যাবে। পেনশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য 'অটল বিমা যোজনা'য় সরকার বছরে হাজার টাকা করে অর্ধেক অর্থ দেবে। প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনায় বছরে ৩৩০ টাকার প্রিমিয়াম দিয়ে ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ২ লক্ষ টাকার জীবনবিমা পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ইপিএফ ও পিপি এফ-এ পড়ে থাকা দাবিহীন ৯ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে বৃদ্ধ, ছোট ও প্রান্তিক চাষির জন্য প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ তহবিল গড়া হচ্ছে। তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ব্যবসায়ী ও মহিলা কল্যাণে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রত্যেক শিশুর নাগালের মধ্যে থাকবে শিক্ষার সঠিক মানযুক্ত মাধ্যমিক স্কুল। যুব সমাজের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা মিশন গড়ার পাশাপাশি নারী নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ধনীদের কাছ থেকে বেশি করে প্রত্যক্ষ কর আদায়, স্বাস্থ্যবিমায় কর ছাড়ের সুবিধা বৃদ্ধি, পর্যটনের মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ১৫০টি দেশের ভিসার সরলীকরণ এই বাজেটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পের মাধ্যমে দেশজুড়ে ৬ কোটি শৌচাগার নির্মাণের পাশাপাশি গঙ্গাদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। খাদ্যসুরক্ষার সুফল যাতে প্রকৃত গরিবরা পেতে পারেন সেজন্য রাজ্যগুলিকে দরিদ্রের তালিকা তৈরির নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল। এবার বিপুল অর্থের অপচয় ও দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে এর ব্যয়বরাদ্দ কিছুটা কমানো হয়েছে। একশো দিনের কাজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে এর ব্যয়বরাদ্দ কমানোর কথা ভাবেনি সরকার। বরং ভালো কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এর বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

এবারের বাজেট ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দু'টি বিষয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। এক) বাজেট সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু করল সরকার। দুই) উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের সম্পর্ক সহযোগিতায় বদলে দেবার প্রচেষ্টা আরও একধাপ এগোলো বলে মনে হল। এবার থেকে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে প্রকল্প ঘোষণার বদলে রাজ্যের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্যকে অনেকবেশি ক্ষমতা আর স্বাধীনতা দিতে চায় বলে মনে হল। আগামী অর্থবর্ষ থেকে তার আয়ের সিংহভাগ রাজ্যকে হস্তান্তর করবে কেন্দ্র। এর ফলে উন্নয়নের ব্যাপারে রাজ্যগুলি আগের থেকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হবে, তেমনি অন্যদিকে নীতি প্রণয়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদির মতো জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র বেশি করে মাথা লাগাতে পারবে।

কিছুটা ধীর গতিতে হলেও পরিকল্পিত পথে এ বাজেট এগোতে পেরেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। ■

অরুণাচল নিয়ে চীনের আগ্রাসী মনোভাব

সীমান্তে ছড়ানো হচ্ছে উত্তেজনার পারদ

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ চীনের কম্যুনিস্ট শাসকরা ভারতকে এশিয়ার বুকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই মনে করে। চীনের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের স্থান নেই। ভারতের চারপাশে যে সব রাষ্ট্র আছে সেখানে চীন নানাভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার, উসকানি দিয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেশি আগ্রহী। মায়নামার, বাংলাদেশ, ভুটান, সিকিম, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় চীন খুবই সক্রিয়। জঙ্গি দলগুলো চীনের অস্ত্রে সক্রিয়। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে চলেছে চীন। প্রতিটি দেশে চীন নিজের সমর্থক ছলেবলে কৌশলে বাড়িয়ে চলেছে। ভারতের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করতে চীন ভারত-বিরোধী কাজও চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতকে টুকরো টুকরো করার ইন্ধন যোগাচ্ছে প্রচারের মাধ্যমে। চীন ইউ এন ও-তে প্রায় সব ব্যাপারে এখনও ভারত বিরোধী কাজ করে চলেছে। মুখে বলছে বন্ধুত্বের কথা। নানাভাবে বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে দলে টেনে তাদের দিয়ে ভারত-বিরোধী রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধিতে চীন সদা তৎপর। পাকিস্তানি জঙ্গি হামলার সঙ্গে যুক্ত লস্কর-ই-তৈবার মতো হিংসাশ্রয়ী দলকে ইউ এন ও-তে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে চীন বিরোধিতা করে। পাকিস্তানকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে চীন সদাই আগ্রহী ও নানাভাবে সাহায্য দিয়ে চলেছে। তিব্বতে চীন নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠাই শুধু করেনি, সেখানে দ্রুত সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। ভারতের দিকে দ্রুত যাতে সৈন্যবাহিনীকে আনা যায় তার জন্যে রাস্তাঘাট তৈরি করে চলেছে। সবচেয়ে বিপদের কথা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ (নেফায়) অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের বলে দাবি করেছে চীন। ৯০ হাজার কিলোমিটার তার নিজের বলে দাবি জানাচ্ছে। তাছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে চীনা সেনাবাহিনী ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন করে অশান্তি পাকাতে চাইছে। সম্প্রতি 'লে'-তে চীন হেলিকপ্টারে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খাবারের প্যাকেট ফেলে দেয়। প্রায়ই সীমান্তে চীন একটা না একটা সমস্যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে চীন যে ভারত আক্রমণ করে হাজার হাজার কিলোমিটার এলাকা ভারতের

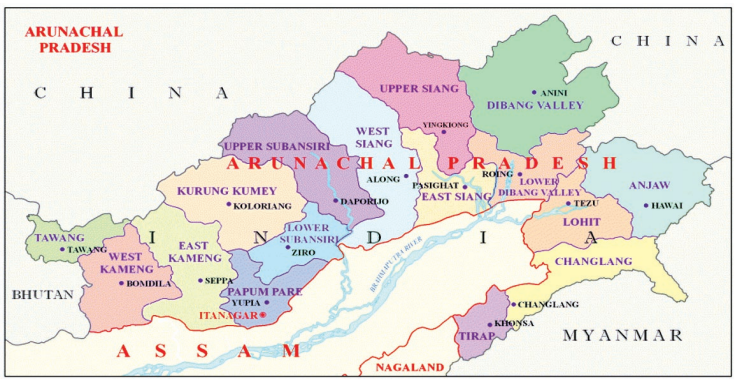

আটকে রেখেছে, তার অদ্যাবধি কোনো মীমাংসা হয়নি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অরুণাচলে দেশের সঙ্গে প্রথম রেলযাত্রার সূচনা করায় চীন বেজায় চটেছে। মোদী কেন অরুণাচলে গেলেন এমন প্রশ্ন তোলার সাহস দেখাচ্ছে চীনা শাসকরা।

চীন বিপুল লোকসংখ্যাকে পাশের দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে তুলতে চাইছে। তার জন্যে নানা কাজ করে চলেছে। কিন্তু জনগণের জন্মসিদ্ধ অধিকার হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে চীন বেশিদিন চলতে পারবে না। চীনের ভেতরে ক্ষোভের আগুন দপ দপ করে জ্বলছে। সেখানকার বুদ্ধিজীবীরাও ক্ষুব্ধ। নীতির দিক থেকে চীন ভারতের উত্থানকে পছন্দ করে না। কম্যুনিস্ট চীন সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী। ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যকে সাহায্য দিয়ে কব্জায় আনা সম্ভব, তাই মায়নামারে আজও চীনের ইঙ্গিতে সামরিক শাসন চলছে। সেখানে সু কী-কে ছলেবলে কৌশলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। চীনের মদতেই মায়নামারে গণতন্ত্রকে গলাটিপে রাখা হয়েছে। ভারতকে তাই চীন সহ্য করতে পারে না। আমেরিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ভারতও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই স্বাভাবিক কারণে চীন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে প্রকাশিত হতে চায়। বিশেষ করে রাশিয়ার পতনে চীন স্বস্তি লাভ করেছে মানসিক দিক হতে। বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে হাঁটতে শুরু করেছে চীন। সেই পুরাতন কিন্তু আগ্রাসী নীতির চিন্তা ভাবনায় চীন মশগুল। অন্য দেশের কথা বাদ দিয়ে বলতেই হয় ভারতকে নিজের পায়ের মাটি শক্ত করতে হবে। সামরিক শক্তি যেমন বাড়াতে হবে তার সঙ্গে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে, যাতে চীনের যে কু-মতলব ভারতকে আর আক্রমণ করতে না পারে। তাছাড়া ভরতের বুকে যারা পঞ্চমবাহিনী রূপে কাজ করতে তৈরি তাদের সম্বন্ধে সরকার ও জনগণকে জাগ্রত প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে হবে যাতে তারা ভারতের ক্ষতি করতে না পারে। তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। নরেন্দ্র মোদী অরুণাচল তথা সমগ্র উত্তরপূর্ব নিয়ে যেভাবে ভাবনা চিন্তা করে চলেছেন তাতেই ব্যাকফুটে পড়ে চীন অরুণাচলে প্ররোচনা তৈরি করেছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

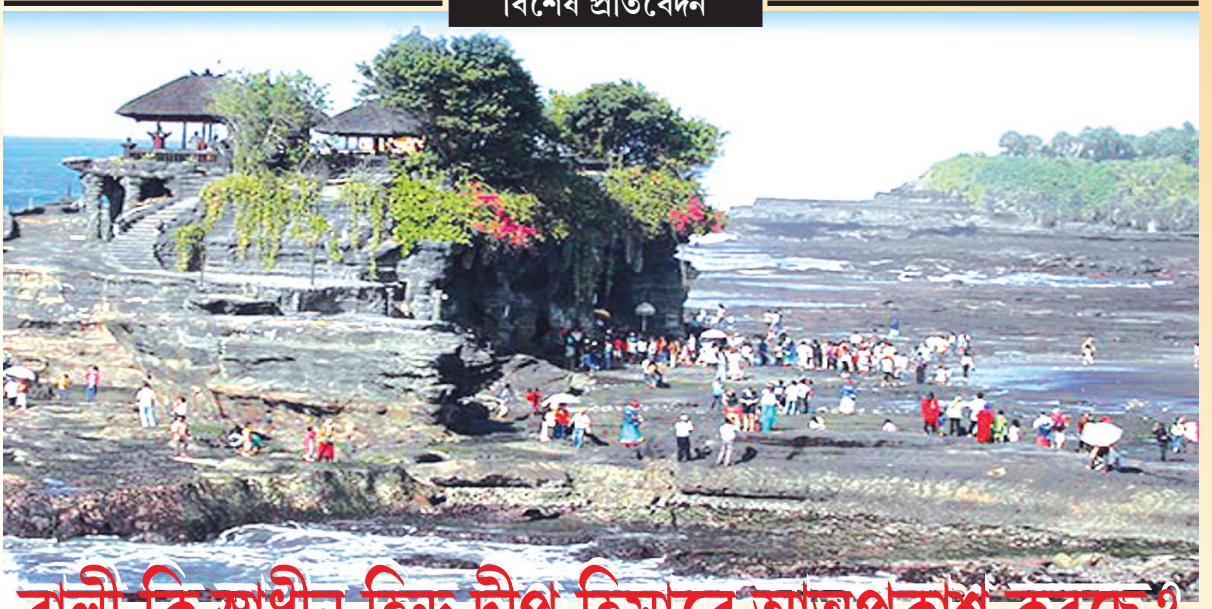

বালী কি স্বাধীন হিন্দু দ্বীপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সারবন্দী ১৩ হাজার ৫০০টি দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া। মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র হলেও সে দেশের জীবনধারার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে। রামায়ণ ও আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে সংস্কৃত শব্দ। এই দ্বীপমালার দেশে এরকম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হিন্দু মুসলমানে যেখানে প্রবল বিদ্বেষ, পরস্পরকে সহ্য না করার মনোভাব প্রবল, যেখানে ব্যতিক্রম ইন্দোনেশিয়া। এখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রাধান্য বিস্তার করেনি। বরং ভারতীয় জীবনধারার প্রকৃত পরিশীলিত রূপ এই অঞ্চলের জীবনযাপনের মধ্যে মিশে গেছে। যা কোথাও একটুও আরোপিত বা বেমানান হবে না। অনুমান করা হয় একসময় দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলি ছিল হিন্দু প্রধান। পরে সেখানে মুসলমান প্রাধান্য এলেও সংস্কৃতির শিকড় গভীর পর্যন্ত চলে যাওয়ায় জীবনধারা থেকে হিন্দু রীতি নীতি বিশ্বাসকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বরং তা যথাযথ মর্যাদালাভ করেছে। দ্বীপগুলির নাম সামনে আসে— জাকার্তা, বালী, যবদ্বীপ বা জাভা ইত্যাদি। আগে বলা হোত দ্বীপময় ভারত। যে দেশে মুসলমান জনসংখ্যার প্রাধান্য সেখানের একটি দ্বীপ বালী কি স্বতন্ত্র হিন্দুরাষ্ট্র হতে চলেছে? হাল আমলে ইন্দোনেশিয়ায় বড়রকম পরিবর্তন হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় গত পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম একজন শাসক পদে বসেছেন যাঁর জন্ম চীনে। এতে খুশি হয়েছেন জাকার্তাবাসী অল্প সংখ্যক চীনা। আর এটা পছন্দ করেনি কট্টরপন্থী মুসলমানরা। এক দিকে মুসলমানরা উন্মত্ত ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করছে। আর অন্যদিকে অল্পকিছু উৎসাহী মানুষ উল্লসিত। বলা হচ্ছে, নতুন রাজ্যপাল ও তাঁর অনুগামী চীনারা ১৯৯৮ সালে স্বৈরাচারি সুহার্তোর সমর্থক ছিল। ওই চীনা প্রশাসক খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতার মুসলমান অধিবাসীরা ওই প্রশাসককে বিধর্মী ও দেশবিরোধী মনে করছে। এর ফলে সেখানে অন্যরকম ঝড় উঠছে।

হিন্দু মন্দির ভর্তি রয়েছে জাভাতে। সেখানে ৬০ শতাংশ নাগরিক হিন্দু। সেখানে সব মিলিয়ে ১০০টির আগ্নেয়গিরি আছে। মাঝে মাঝে অগ্নি উদ্‌গীরণও হয়। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী ও সংস্কৃতি জিজ্ঞাসুদের কাছে এবং ইউরোপের পর্যটকদের কাছে বালী অত্যন্ত আকর্ষণীয় দ্বীপ। যখন ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা সেখানে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছে তখনই আমেরিকার রাজনীতিক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন বালীকে মুসলমান প্রধান ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা করার। তবে অনেকে বলছেন, ভারতের এদিকে লক্ষ্য নেই। এখানে হিন্দুদের সহিষ্ণুতা ও ধর্মপ্রিয়তা প্রবল। হিন্দু মন্দিরগুলোর প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে বহু যুগ ধরে। এখনও সেই পরম্পরা বজায় রয়েছে।

বালী এমনই এক দেশ যেখানে হিন্দুরা রয়েছে মাথা উঁচু করে। অতীতে কোনো এক সময় ভারত থেকে কোনো প্রভাবশালী হিন্দু জাভাতে গিয়েছিলেন। তাদের বংশধররা সেখানে মর্যাদার সঙ্গে ছিলেন। বোরবুদুর-এর বিশাল মন্দির কালের শাখা হয়ে রয়েছে। এখন বালীর অনেক পরিবারই গর্বের সঙ্গে বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা অমুক রাজপরিবারের। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান ও আধুনিক ইতিহাস নিয়ে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে একটি বই— Eat, Pray & love। লিখেছিলেন এলিজাবেথ গিলবার্ট। সেখানে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, পরম্পরা অনুসারে হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান পুরোমাত্রায় হয় এখানকার গ্রাম ও শহরের মন্দিরে। এখানকার মানুষরা ১৪৮টি মুক্তোর জপমালা ব্যবহার করেন। বালীকে বলা হয় দেবতাদের দ্বীপ। জার্মান আলোকচিত্রী জর্জ ক্রাউজার ১৯৩০ সালে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ঈশ্বরের উপর রাগ করেছি, কেন তিনি এখানে আমাকে জন্ম নিতে দেননি?' ইন্দোনেশিয়া সরকার পর্যটক আকর্ষণের জন্য বালীকে বলেছেন— দ্য আইল্যান্ড অফ গড। এর মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে হিন্দু সংস্কৃতি।

পশ্চিমি রাজনীতিকদের অনুমান আগামীদিনে বালী এক স্বতন্ত্র হিন্দু দ্বীপ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ■

পরিত্যক্ত শিশুকন্যার সত্যিকারের বাবা—দেবেন্দ্র আগরওয়াল

দেবেন্দ্র আগরওয়াল ছয় মাসের মধ্যে ছ'টি শিশুকন্যা উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং শিশুর পালন পোষণের জন্য ২০০৭ সালে তাঁর 'মা ভগবতী বিকাশ সংস্থা'-র শাখা রূপে মহেশ আশ্রম শুরু করেন। এখন পর্যন্ত তিনি ১১০টি শিশুকন্যা পালন পোষণ করেছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নানারকম আলাপ আলোচনায় প্রায় সবাই বলছেন এটা নাকি আধুনিক যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, সবাই নাকি সভ্য হয়েছে, এখন কোনো প্রকার ভেদাভেদের স্থান নেই। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে। এরকম যুগেও কোনো কোনো পরিবারে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে মা ছাড়া বাকি সবার মন খারাপ হয়ে যায়। এখনো এই যুগে রাজস্থানে কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে প্রায় অভিশাপ মনে করা হয়। রাজস্থানের ঝোপঝাড়ে, খাল-বিল-নদীর ধারে এখনো

শিশুকন্যার সঙ্গে দেবেন্দ্র আগরওয়াল

সদ্যোজাত কন্যাসন্তান পড়ে থাকতে দেখা যায়। ২০০৫ সালে উদয়পুরের দেবেন্দ্র আগরওয়াল কর্মোপলক্ষে প্রতাপগড় জেলায় একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে খুব সকালে খবর পান সদ্যোজাত একটি কন্যাসন্তান গ্রামের বাইরে খালের ধারে পড়ে আছে। তিনি সেই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে বেশ কয়েকমাস হাসপাতালে রেখে নিজের বাড়ি উদয়পুরে নিয়ে আসেন। রাজস্থানের পরিসংখ্যান অনুসারে প্রায় প্রতিদিন এরকম শিশুকন্যা পড়ে থাকার খবর স্থানীয় থানায় আসে।

দেবেন্দ্র আগরওয়াল ছয় মাসের মধ্যে ছ'টি শিশুকন্যা উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং শিশুর পালন পোষণের জন্য ২০০৭ সালে তাঁর 'মা ভগবতী বিকাশ সংস্থা'-র শাখা রূপে মহেশ আশ্রম শুরু করেন। এখন পর্যন্ত তিনি ১১০টি শিশুকন্যা পালন পোষণ করেছেন। শ্রী আগরওয়াল আই এ এন এস সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, রাজস্থানে শিশুকন্যা জন্ম নেওয়া একপ্রকার অভিশাপ। সদ্যোজাত শিশুকন্যা কুকুর বা শিয়ালের মুখে ফেলে দিয়ে আসা হয়। ২০০৫ সালে আমি প্রথম যে শিশুকন্যাকে পাই তার নাম রেখেছি রাধা। রাধা আজ ১৫ বছরের কিশোরী। ২ বছর বয়সে এক সহৃদয় দম্পতি তাকে দত্তক নিয়ে গেছেন। রাধা জানে তাঁরাই তার প্রকৃত মা-বাবা।"

রাজস্থান নবজাত কন্যাসন্তান হত্যা মামলায় কুখ্যাত। এখানে পুত্র-কন্যা অনুপাত হলো ১০০০ : ৮৮৩। এই লিঙ্গানুপাত অসাম্যে খুবই চিন্তিত মা ভগবতী বিকাশ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্র আগরওয়াল। তিনি বলেন, এই সংস্থা আদতে একটি আশ্রম। এই আশ্রমে অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু বিশেষ করে শিশুকন্যাই নেওয়া হয়। আই এ এন এস-কে তিনি জানান, '১১০ শিশুকন্যার মধ্যে ৯৪ জনকে ইতিমধ্যে সহৃদয় দম্পতিরা দত্তক নিয়েছেন। এখন ১৬টি কন্যা আছে, তাদেরও কারা কারা দত্তক নেবেন তার আইনি কাগজপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে।

দেবেন্দ্র আগরওয়াল শিশুকন্যার দেখভালের জন্য সংস্থার আলাদা বিভাগ করে নাম দিয়েছেন 'মহেন্দ্র আশ্রম। মহেশ আশ্রমে বেশ কয়েকজন মাতৃহৃদয়া মহিলা কাজ করেন। তাঁরা নিজ সন্তান জ্ঞানে শিশুগুলিকে প্রতিপালন করেন। এরকমই একজন জানান, এখানে শিশুদের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া এখানকার সরকারি হাসপাতাল চিকিৎসার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে থাকে। আশ্রমের পুরো পরিসর সিসিটিভি-র আওতাভুক্ত করা আছে। আধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা আছে।

২০০৬ সালে রাজস্থানে যখন কন্যাভ্রূণ হত্যার লহর এসেছিল তখন দেবেন্দ্রকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি তাঁর মার্কেটিং ক্যারিয়র ছেড়ে দিয়ে শিশুকন্যা বাঁচানোই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান করেন। তিনি বলেন, আমি জানি না কেন যে আমার মন শিশুকন্যার জন্য কেঁদে উঠেছিল। তখন থেকেই আমি ওদের বাঁচানোর জন্য মনস্থির করে ফেলি। রাধার জন্য আমি আমার ঘরের দাওয়ায় একটা দোলনা লাগিয়েছিলাম, কিন্তু এক মাসের মধ্যে আমাকে তিনটি দোলনা লাগাতে হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, '২০০৭ সালেই আমার সংস্থার নাম মহেশ আশ্রম রাখার সিদ্ধান্ত নিই। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ১২০টি শিশুকন্যার মধ্যে ১১০ জনকে বাঁচাতে সক্ষম হই। আমি চাই আমার আশ্রমের সব শিশুই তাদের মা-বাবা পাক, ঘর পাক। আবার আপশোসের সঙ্গে বলেন, কিছু কিছু দম্পতি অবাঞ্ছিত সন্তান মনে করে দত্তক নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু আমি বলি, এই নিরপরাধ শিশুকন্যারা তো নিষ্পাপ! ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে যতই আমরা নিজেদের ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে পারি, ততই জ্ঞান ও কর্মের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সকল জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত উৎস ইন্দ্রিয়জগতের ঠিক বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত। সেই উৎসের দিকে আমাদের অগ্রগতি নির্ভর করে, কতটা আমরা অপর বিন্দু থেকে নিজেদের বিমুক্ত করেছি তার উপর। এরই নাম ত্যাগ আর এই ত্যাগই সেই অনন্ত আনন্দলাভের পথ।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বয়ঃসন্ধির সমস্যায় হোমিওপ্যাথি

বাবা মায়ের অতিরিক্ত শাসনের ফলে ভয় পেতে শুরু করে স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হয় না। কোনো একটা অন্যায় করে ফেললে বাবা-মাকে না বলে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ফলে কষ্ট পায় নিজে, সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শিশু জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠে প্রকৃতির খেয়ালে, ঋতু আসে, ঋতু যায়। সে বুঝতে পারে, গড়ে উঠছে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা। মাতৃস্নেহ, পিতার শাসন ও দাদু-দিদার আবদার তাকে বড় হতে সাহায্য করে। তবু এই বেড়ে ওঠার মধ্যে আসে বাধা, বিস্ময়। হঠাৎ একটা শারীরিক পরিবর্তন তাকে মানসিকভাবে ব্যাহত করে। সে বুঝতে পারে না কি হল, কেন হলো, বলতে পারে না লজ্জায়। এটা কি তাহলে মারাত্মক কোনো রোগ, যার পরিণতি মৃত্যু? অভিভাবকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়। লজ্জা পায়, প্রশ্ন করে সতীর্থদের। যারা নিজেরাও ঠিক জানে না। কেউ কেউ চটকদারি বইপত্র ঘেঁটে এর একটা অর্থহীন উত্তর তৈরি করে এবং বন্ধুবান্ধবদের বোঝায়, ফলে ঘটে বিপদ। তাইতো আজ এতে বেড়ে গেছে কুমারী মাতৃত্ব, ভ্রূণহত্যা।

এই সময়টাই বয়ঃসন্ধিকাল। Adolescent period বালক থেকে যুবক কিংবা বালিকা থেকে যুবতী হয়ে ওঠার মুহূর্ত। কারো মতে ১০-১৯ বয়স সন্ধিকাল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর সন্ধিকাল। গুরুজন, শিক্ষক শিক্ষিকা, বড়দাদা, বড়দিদি প্রত্যেককেই অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়, বুদ্ধি করে, ধৈর্য ধরে সময়টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। না হলে শিশুটি যথাক্রম ভাবে, সুন্দরভাবে বড় হতে পারবে না; প্রস্ফুটিত হওয়ায় আগেই ঝরে পড়বে।

চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, তিরুবন্তপুরম, কেরলের ডিরেক্টর এম. কে. সি. নায়ারের মতে— এটা কেবলমাত্র দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক স্বাস্থ্যসচেতন ভারতীয় নাগরিকের উচিত বয়ঃসন্ধিকালের মুহূর্তে শিশুকে যথেষ্ট খেয়াল রাখা, যত্ন করা দরকার।

আইসিএমআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চ)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের জীবনের ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বয়ঃসন্ধিকালে মূলত তিনটি পরিবর্তন ঘটে। (ক) দৈহিক পরিবর্তন (খ) মানসিক পরিবর্তন এবং (গ) যৌন চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ।

দৈহিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেদের পরিবর্তন মেয়েদের তুলনায় একটু দেরিতেই হয়। ছেলেদের গলার স্বর ভেঙে যায়। গোঁফের রেখা দেখা যায়। হাতের নীচে ও পায়ে লোম জন্মায়। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু তৈরি হয় ও বীর্যক্ষরণ শুরু হয়। মেয়েদের পরিবর্তন আসে মোটামুটি ৯-১৩ বছরের মধ্যে। এসময় মানসিক পরিবর্তন হয় অনেক। এক একজনের কাছে তা আসে এক এক রূপে। ছেলেদের যেদিন প্রথম স্বপ্নদোষ হয়, সেদিন হতভম্ব হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না কি? কেন? অন্যদিকে মেয়েদের ঋতুস্রাবের প্রথমদিন তাঁরা প্রায় কেঁদেই ফেলে। আমি আর বাঁচব না, কারণ আমার ভারি অসুখ করেছে। ভয় ও লজ্জামিশ্রিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেকের মতে এটা স্বপ্নদোষ। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে এক একটা সমাধান বার করার চেষ্টা করে। তবু মা-বাবার কাছে সহজ করে বলতে পারে না। এ বিষয়ে সাবধানতা নিয়ে মা-বাবা সন্তানদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে লজ্জা পান।

এই অন্তরায় যদি দূর করা যায় তাহলে পুত্র বা কন্যার জীবন হয়ে উঠবে সহজ সুন্দর এবং সঠিক সময়ে যৌন জীবনকেও সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারবে।

বয়ঃসন্ধির সময়ে শরীরের প্রকৃত বৃদ্ধি হওয়ার দরুন এই বয়সী ছেলেমেয়েদের খাদ্য তালিকায় প্রচুর প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য পরিমাণ মতো খাওয়া দরকার। তবে মাছ, মাংস খাওয়ায় উপায় না থাকলে ভাববেন না। ছেলেমেয়েদের পুষ্টির জন্য ডিম, সয়াবীন, বাদাম, অঙ্কুরিত ছোলা ও ডাল জাতীয় খাদ্য পরিবেশন করুন। যারা খেলাধুলো করে তাদের অতিরিক্ত ৩০ গ্রাম তেল বা চর্বি অথবা ৫০ গ্রাম বাদাম খাওয়া আবশ্যক।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের খাওয়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত, কারণ এই কিশোরীই আর কিছুদিন পরে মা হবে। একটি সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দিতে গেলে মায়ের পুষ্টির প্রতি যত্নবান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কন্যা সন্তানের মধ্যে ৬০ শতাংশ ভোগে কম বেশি মাথার যন্ত্রণায়, ২২ শতাংশ কমদৃষ্টি শক্তিতে, ৪১ শতাংশ কানের সমস্যায়, ৪৪ শতাংশ দাঁতের যন্ত্রণায়, ২৫ শতাংশ অনিমিত ঋতুস্রাবে এবং ২১ শতাংশ অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে, ৭২ শতাংশ সাদাস্রাবের নির্গমনে কষ্ট পায়।

বয়ঃসন্ধি মূলত তিনটি Ex দ্বারা

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। Experimenting Experiencing and Expanding their effort প্রত্যেকের মধ্যেই যৌন অনুভূতি ও সঠিক যৌন পরিচিতির মনোভাব গড়ে তোলে। এই যৌন পরিচিতির আবার বিভিন্ন দিক রয়েছে। শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক। রোমান্টিক অস্তিত্বের প্রতি যৌন চেতনা উল্লেখযোগ্য।

যৌন চেতনা বা ভাবনা ভয় লজ্জা বা ঘৃণার বিষয় নয়, তা মন থেকে দূর করতে হবে। বরং এই বিষয়টি একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতা দেয় শরীরে, মনে, আবেগে এবং সর্বোপরি অনুভূতিতে। তবে অবশ্যই সঠিক বয়সে সঠিক সময়ে যৌন চেতনাকে বাড়াতে হলে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ গঠনের দিকে নজর রেখে সমস্ত ভয়, ভ্রান্ত ধারণা, জটিলতা ত্যাগ করতে হবে।

দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, দীর্ঘ অসুস্থতা সামাজিক কুসংস্কার, প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশ, মা ও বাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব, মতানৈক্য, বিচ্ছেদ, অতিরিক্ত শাসন অথবা অতিরিক্ত স্বাধীনতা এবং কুসঙ্গের ফলে ছেলেমেয়েরা বিকশিত হতে পারে না।

ফলস্বরূপ, মানসিক অবসাদ, ভারসাম্যহীনতা, অপরাধপ্রবণতা, বিদ্রোহী মনোভাব, ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়া, রাগ, বিদ্বেষ, একগুঁয়ে স্বভাব, হতাশা, বিরোধিতা, অহেতুক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সংবাদপত্র এবং বেতার কিংবা দূরদর্শনের সংবাদে খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া তদুপরি ড্রাগ নেবার প্রবণতার খবর কানে আসবেই। এতে শরীর ও মন কেঁপে ওঠে। কারণ ঘরে আমাদের ছেলে বা মেয়েটি ধীরে ধীরে এক একটা বয়স পার করেছে।

তাই বাবা-মা'র প্রতি চিকিৎসকদের পরামর্শ, পুত্র-কন্যার সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করুন, তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে সমস্ত রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করুন। তাদের বুঝতে দিন তারা আপনার অত্যন্ত প্রিয় এবং ভালমন্দ সম্পর্কে আপনি যথেষ্ট সচেতন, তাদের বুঝতে দিন যে আপনি তাদের যথেষ্ট ভালোবাসেন কিন্তু তার কোনো কোনো চাল-চলন আপনি মেনে নিতে পারছেন না। কষ্ট পাচ্ছেন। কোনো অন্যায় বা ভুল করলে শুধরে দিন যাতে সে আর কোনোদিনও ভুল না করে। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাদের অস্বাভাবিক আচরণের জন্য অযথা তিরস্কার না করে তাদের মনের কাছাকাছি পৌঁছনো দরকার। কারণ এই সময় প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীই খোঁজে ভালবাসা নিরাপত্তা, স্বীকৃতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও নির্ভরযোগ্য কোনো সঙ্গী। অহেতুক ছেলেমেয়েদের দাবিয়ে রাখা, অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা বা আত্মসমর্পণ মূলক মনোভাব— এসব যত শীঘ্র সম্ভব পরিহার করুন।

কখনও কখনও বাবা মায়ের অতিরিক্ত শাসনের ফলে ভয় পেতে শুরু করে স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হয় না। কোনো একটা অন্যায় করে ফেললে বাবা-মাকে না বলে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ফলে কষ্ট পায় নিজে, সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রিয় সঙ্গীকে নিয়ে অল্প বয়সে একত্রে বসবাসের সিদ্ধান্ত তাকে পদে পদে ফেলে বিপদে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীরা যত বেশি স্কুলের বিভিন্ন Extra curricular activities ও সমাজ কল্যাণমূলক নানা কাজে লিপ্ত থাকবে তাদের মানসিক ভারসাম্য হারাবার সম্ভাবনা বা নেতিবাচক ব্যবহারিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা তত কম। বিশেষজ্ঞগণ ৮টা পাবলিক স্কুলে ৩, ৪৯৯ জন ছাত্রছাত্রীর উপর সমীক্ষার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সমীক্ষকগণের মতে, high risk Schaviar-এর ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করে অর্থাৎ যাদের কুসঙ্গে মেলামেশা মদ্যপান বা অন্য কোনো হিংসার আশ্রয় নেবার প্রবণতা আছে তাদের স্কুলে বিভিন্ন ছোটখাট কাজকর্ম নিয়োজিত করে তাদের কাজে উৎসাহ দিলে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বয়ঃসন্ধির নানা রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত একটি বিদেশি পত্রিকায় সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, প্রায় ৩/৪ বছর থেকে ১৭/১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে যাদের বোতলের শীতল পানীয় খাবার প্রবণতা বেশি তাদের ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত অপুষ্টি দেখা যা মানব দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পরিশেষে, আধুনিক ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ক্ষেত্রে সংযত হতে হবে। সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে অনেক সহজ ও সবল হতে হবে। অহেতুক গোপনীয়তা সমস্যারই সৃষ্টি করে। ছলে বলে কৌশলে সাধারণ সম্পর্ককে যৌন সম্পর্কের দিকে নিয়ে যাওয়াটা অন্যায়। গর্ভপাতকে কখনো সহজভাবে নেওয়া উচিত নয়। গর্ভপাত মোটেই ভাল নয়। আমাদের দেশে যেহেতু এখনো কুমারী মা ও তার সন্তান কেউ মর্যাদা পায় না, এজন্য বাধ্য হয়ে গর্ভপাত ঘটানো হয়। আবার যেসব অবিবাহিতা মেয়ের গর্ভপাত হয়েছে ওইসব মেয়ের পরবর্তী সময়ে খারাপ চোখে দেখা উচিত নয়। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমাদের দেশে এখনো বাল্য-বিবাহ হয়ে থাকে। এটা উচিত নয়। মেয়েদের ১৮ বছরের কমে বিয়েতে রাজি হওয়া উচিত নয়। আমাদের শরীর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জানতে হলে জননযন্ত্রকে জানতে হবে। তবে জানা এবং তাকে অভ্যাসে পরিণত করা গুলিয়ে ফেললে চলবে না। যৌনজ্ঞান মানে যৌন পটুত্ব শিক্ষা নয় বা যৌন অভ্যাস নয়, সংযমই যৌনতাকে সুন্দর করে। বিয়ের পর জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। নিষিদ্ধ আলোচনা সহজভাবে মেনে নিলে জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে।

পাঠক আলোচনা থেকে বুঝেছেন বয়ঃসন্ধির সময় কিশোর কিশোরীদের কতরকম সমস্যা হয়। এই সমস্যার সমাধান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সম্ভব। অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন সহজে।

(লেখক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিও চিকিৎসক)

কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক কার্যক্রম

গত ৮ মার্চ মালদা জেলার গৌড় খণ্ডের কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ৯৫ জন তরুণ, ৭০ জন বালক এবং ৩৪ জন শিশু স্বয়ংসেবক এই উৎসবে শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। শারীরিক কার্যক্রমের মধ্যে নিযুদ্ধ, সমতা, দণ্ড, আসন, গোপুরম, পাল্কিযুদ্ধ, ও সূর্য নমস্কার হয়। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনতার গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী রঘুনাথ দাস। সহ-প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত এবং মালদা বিভাগ কার্যবাহ রামেশ্বর পাল, বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডল, জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ প্রলয় দাস, জেলা প্রচারক মলয় দত্ত উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক উৎসবের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন রামেশ্বর পাল। ৫০ জন অভিভাবক ও অভিভাবিকা উৎসব প্রত্যক্ষ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাঞ্চনতার প্রভাত, সায়ম এবং রাত্রি তিনবার শাখা হয় এবং গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে জনপদ সংস্কৃত সম্মেলন

গত ১ মার্চ জলপাইগুড়ি জনপদ সংস্কৃত সম্মেলন হয় স্থানীয় সারদা শিশুতীর্থে। ৫টি স্থান থেকে ১০০ জন ছাত্র, ১০ জন শিক্ষক এবং ৪০ জন সংস্কৃতানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বামী দেবপ্রকাশজী, বিভাগ সংযোজক ড. শ্যামকুমার ঝা, জলপাইগুড়ির ডিপিও শুকদেব নন্দী, জলপাইগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সন্দীপ গুণ, অবসর প্রাপ্ত আয়কর আধিকারিক অরুণাভ ভট্টাচার্য এবং বনবিহারী ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মানস ও গৌতম।

সমাবেশ সমাচার

মালদায় পরিবার প্রবোধন কার্যক্রম

গত ১ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদানগর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরে পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে এক সহ-ভোজের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এই সহভোজ কার্যক্রমে ৪০টি পরিবারের ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার কুটুম্ব প্রবোধনের উদ্দেশ্য এবং সমাজে তার প্রতিফলন বর্ণনা করেন। প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার-সহ জেলা ও বিভাগ কার্যকর্তারা তিন ঘণ্টার এই কার্যক্রমে সাংগঠনিক আলোচনা করেন ও সহ-ভোজে অংশগ্রহণ করেন। আগামীতে বিভাগের সব জেলাতে এবং মহকুমাতে এই ধরনের সহভোজের কার্যক্রম হবে বলে জানিয়েছেন কুটুম্ব প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল।

পরলোকে জ্যোৎস্না বর্মন

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হলেন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের প্রয়াত স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ বর্মনের সহধর্মিণী জ্যোৎস্না বর্মন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া শহরে মেয়ে-জামাই নন্দিনী ও স্বরাজ দাসের বাড়িতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর জামাই স্বরাজ দাস বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা। তিনি ২ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

তিনি দুর্গাবাহিনী ও রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম মেদিনীপুরে সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ পালন

গত ১ মার্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর শহরের স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী মহোৎসব সমিতির সভাপতি নন্দলাল লোহিয়া, রাজ্য সম্পাদক সুধাংশু পাত্র এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ ও নিগমানন্দ মহারাজ।

এই অনুষ্ঠানে জেলার সমস্ত এলাকার কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই জনসমাগমে যুব সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সদস্য সমরেশ রায়ের পিতৃদেব রামমোহন রায় গত ১৬ জানুয়ারি ইন্দপুর ব্লকের পুরুষোত্তমপুর গ্রামে পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান-২০১৫

কলকাতা মহানগরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সামাজিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আগামী ১ এপ্রিল ২০১৫, বুধবার বিকাল ৫টায় **ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান** অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কলকাতায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'র রাষ্ট্রীয় সংযোজক **দীননাথ বত্রা-কে** এবছর সম্মান প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক **মোহনরাও ভাগবত** অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

সহজ ভঙ্গিতে বলা মহাজীবন কথা

পুস্তক প্রসঙ্গ

রমাপ্রসাদ দত্ত

ছোটোরা গল্প শুনতে ভালোবাসে সবদেশে সবকালে। যাঁরা তাদের শৈশব কেড়ে নিয়ে যন্ত্র তৈরি করতে চান তাঁরা ছোটোদের একেবারে কেজো জগতের কঠিন দ্রব্যগুলো গিলিয়ে দিয়ে চটজলদি বড়ো করার পক্ষে। চারপাশে ওই ধরনের মানসিকতার লোকজন দ্রুত বাড়ছে। শুধু

হিসেবের অঙ্ককষে বড়োদের পা তোলা পা ফেলা। সবক্ষেত্রে এটাই দেখা যাচ্ছে। তবু তার মধ্যে কিছু মানুষ উদ্যোগ নিয়েছেন ছোটোদের বড়ো করে তুলতে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষা করে। লালন করতে হয় শিশুদের অনেক যত্ন ভালোবাসায়। তাদের চাহিদা বুঝতে হয়, তাদের ভাবনা জানতে হয়, কল্পনার শরিক হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। বড়োদের সেই মন থাকে না বলেই তাঁরা নিজেদের পছন্দমাফিক ছাঁচে গড়তে চান ছোটোদের। তাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। ছোটোরা বড়ো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেহমনের যথাযথ বিকাশ ঘটছে না। অনেকটাই ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ছোটোদের জন্যে যেসব কাজ হয় তার পিছনে স্নেহ, ভালোবাসা ও আবেগ জড়ানো থাকা দরকার। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সেসব উধাও হয়ে গেছে। ঘরে বাইরে সমাজে সংসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এমনকী, যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের লক্ষ্য কতদিনে শিশু কিশোরের ভোটের বয়েস হবে। আগে থেকে তাদের মগজ ধোলাই করতে পারলে নিজেদের দলে কিছু সমর্থক বাড়বে। এরকম মতলবি ভাবনাচক্রের জটিল পদ্ধতিতে দম আটকে হাঁসফাঁস করছে ছোটোরা— এটা অত্যন্ত চেনা ছবি। আমরা খুব কম জন নাগরিক সচেতনতা বজায় রেখে ছোটোদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করছি। এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দেখলে ভালো লাগে। যেমন রূপশ্রী দত্তর লেখা 'গল্প ভালো আবার বলো।'

রূপশ্রী সাজিয়েছেন দুই মলাটের মধ্যে ২৪জন বিখ্যাত নারী পুরুষের কথা। বলা হয়েছে একেকজনের একেকরকম ভূমিকা। কেউ গৃহাঙ্গনে নেপথ্যে থেকে সন্তানকে স্নেহে যত্নে উপযুক্ত শিক্ষায় বড়ো করে তুলেছেন। এই বড়ো হওয়া মানে প্রকৃত মানুষ হওয়া। বড়ো হওয়া তো সহজ, জীবধর্ম অনুযায়ী তার বৃদ্ধির ও বিকাশ ঘটবে। কিন্তু অস্তিত্বকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে তৈরি করতে হয়। সুরুচি সুশিক্ষা সুচেতনা সুস্বাস্থ্য— এসব মিলিয়ে শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছোনো। তারপর অনেক ধরনের কাজের ডাক আসে। সেসব কাজে নিজস্ব ভূমিকা নিষ্ঠায় পালন করতে হয়। চব্বিশজন মহান পুরুষ ও মহীয়সী নারীর কথা সুন্দর ভঙ্গিতে গল্পের মতো করে শুনিয়েছেন। ভারতবর্ষের সমাজজীবনে নিত্য স্মরণীয় ও অনুসরণীয় নারীপুরুষ কম নন। তাঁদের জীবনকে আদর্শ করে এগিয়েছেন বহুজন। মেবারের মহারানা প্রতাপ সিংহের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে। তারপর একে একে এসেছে অনেকের জীবনকথা। আকর্ষণীয় শিরোনামে। লক্ষ্মীবাঈ, সিরাজ-উদ্-দৌলা রাণী রাসমণি, রানা প্রতাপাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত, সম্রাট অশোক, বিক্রমাদিত্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, বীরবল, অতীশ দীপঙ্কর, গণেশ, রাবণ, কৃষ্ণ, অগস্ত্য, চন্দ্রমণিদেবী, ভুবনেশ্বরীদেবী, শচীনদেবী, স্বর্ণলতাদেবী পুতলীবাঈ, দেবকী, সারদাদেবী, কুসুমকুমারী দাশ।

একটি দুটি ছাড়া বাকি লেখা প্রায় একই আয়তনে ধরা আছে। ছোটো পাঠকদের কথা প্রকাশক ও লেখিকা মনে রেখেছেন। এক একজনের জীবনকথা পড়ার পর একটু থামতে হবে। মনে হবে অনেক কথা। তারপর অন্য কাহিনিতে যাওয়া। বই শেষ করার পর মন বলবে, এই বই যত্নে বারবার পড়ার এবং অন্যদের পড়াবার। এই বই ছোটোদের শিক্ষা দেবে, প্রেরণা জাগিয়ে তুলবে। সমস্ত বৃত্তান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যুধাজিৎ সেনগুপ্তর অসাধারণ রেখাচিত্রে। দক্ষ শিল্পী দরদ দিয়ে কাজ করেছেন কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ছবিগুলি এই বইয়ের সম্পদ বলা চলে।

গল্প ভালো আবার বলো। রূপশ্রী দত্ত। মুখার্জি পাবলিশিং, ৮বি/২, টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম ৮০ টাকা।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

শব্দরূপ-৭৪১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

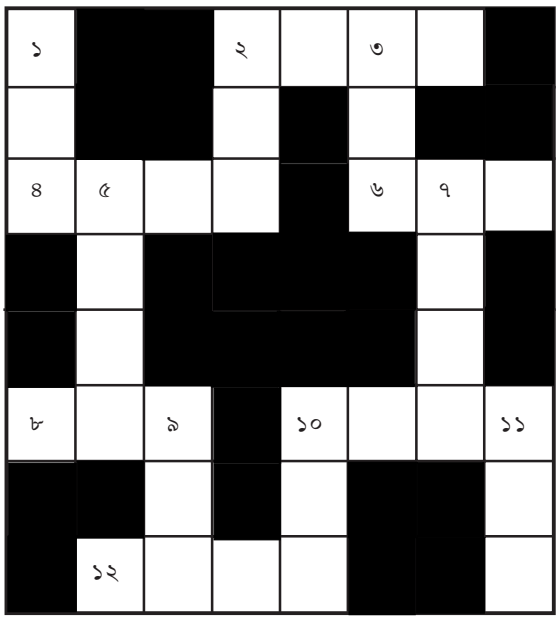

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. যে মাথা নীচু করিয়াছে, ৪. বসন্তকালে যে শস্য কাটা হয়, গম, যব কলাই ইত্যাদি, ৬. হিমালয়স্থ গহ্বর যার ভিতর দিয়ে গঙ্গা বের হয়েছে, ৮. রাধিকার স্বামী, ১০. দাতার ওজনের সমান অর্থাদি দান, ১২. সাহিত্যিক সমরেশ বসু-র ছদ্মনাম; তীব্র বিষ।

উপর-নীচ : ১. সরল, কৃষ্ণের পিতৃব্য, ২. প্রণম্য, পূজনীয়, ৩. স্বামীজী এই স্থানে বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন, ৫. কমলা, লক্ষ্মী, ৭. খসড়া, পাণ্ডুলিপি, ৯. নবীন, ১০. তুলা হইতে প্রস্তুত দেশী কাগজ বিশেষ, ১১. নববিবাহিতা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

■	উ	দ	য়	ন	■	■	উ
কৃ	প	■	■	গ	■	■	ত্ত
■	গু	■	■	দ	শ	হ	রা
দ	প্ত	র	■	■	কা	■	■
■	■	ক্ষ	■	■	র	ভ	স
দ	ম	ক	ল	■	■	গী	■
ক্ষি	■	■	ব	■	■	র	ম্ভা
ণা	■	■	জ	য়	দ্র	থ	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৭৪১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

▯ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

▯ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

▯ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

▯ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

▯ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

▯ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

▯ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

▯ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

▯ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

▯ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ১৯

বান্দার বিজয়ী বাহিনীর হাতে হতভাগ্য মুঘলরা কচুকাটা হয়।

ওরাজির খাঁনের সেনাবাহিনীর কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি। অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী— সবাই পর্যুদস্ত হয়।

HISTORY

সামানার চাইতে সিরহিন্দের দশা আরও খারাপ হয়।

এই অভিশপ্ত নগরের কি হবে?

ধ্বংস করা হোক।

তাই হলো, সিরহিন্দ ধ্বংস হলো।

ক্রমশঃ

স্বস্তিকা জাতীয় ভাবনার বাহক। সেই ভাবনা স্বস্তিকার মাধ্যমে যাঁরা প্রচার-প্রসারের কাজে যুক্ত তাঁরা স্বস্তিকার কার্যকর্তা। আপনার এলাকায় স্বস্তিকার কার্যকর্তার নাম ঠিকানা

শিলিগুড়ি

- **মনোরঞ্জন মণ্ডল**
  শিলিগুড়ি জংশন
  ৯১২৬৮৪৩৭১৬
- **অরবিন্দ বাগচি**
  শিব মন্দির, শিলিগুলি
  ৯৯৩২৫৯৫৫৮৫
- **শতাব্দী সদন**
  সেবক রোড, শিলিগুড়ি
  ৯৪৩৪৩৩৮৩৯১
- **শারদা শিশুতীর্থ**
  সূর্যসেন কলোনি, শিলিগুড়ি
  ৯৬৪১৭৪৬৭৫৫
- **সুবোধ পাল**
  ভরতনগর, শিলিগুড়ি
  ৯৪৭৬৩৯০৯৪০
- **তন্দ্রা সরকার**
  ফুলেশ্বর, শিলিগুড়ি
  ৯৮৩২৫৫৫২১৭
- **সুধীর ঘোষ**
  রথখোলা, শিলিগুড়ি
  ৯৬৪১৩৫০৮৫৭
- **অঙ্কুর সাহা**
  হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
  ৯৭৭৫৩৪৫৭০
- **কমোল ঘোষ**
  ঘোঘোমালি
  ৯৬৪১৭৩৩৬৬৬
- **গোপীনাথ কর্মকার**
  আশিঘর, তেলিপাড়া
  ৯৪৩৪৩৫০৫৯৬
- **দীপক মহন্ত**
  ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি
  ৯৬৪১৭৪৬৭৫৫
- **সঞ্জীব পাল**
  রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি
  ৯৬৪১৩৪৮৮৮১
- **দীপঙ্কর চক্রবর্তী**
  কাওয়াখালি, শিলিগুড়ি
  ৯৮৩২৩৩০৬৩৩
- **ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার**
  আমবাড়ী
  ৯৪৩৪৫১৩৪৭৮
- **সুজিত দাস**
  নকশালবাড়ি
  ৯৮০০৮৬৭৯৯০

জলপাইগুড়ি

- **চন্দন রায়**
  কদমতলা, জলপাইগুড়ি
  ৯৯৩৩৭৭৩৯১৩
- **বিমান ঝা,**
  রাজগঞ্জ
  ৭৬০২৩৮৫৬৩৯
- **ডাঃ প্রাণেশ দে**
  ফাটাপুকুর
  ৮১১৬৪১০৫৫৫
- **দেবাশিস বসুভাট**
  ময়নাগুড়ি
  ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
- **দেবাশিস চক্রবর্তী**
  হলদিবাড়ি
  ৯৯৩২৫৩৫০১৯

আলিপুরদুয়ার

- **সুনীল কুমার ধর**
  আলিপুরদুয়ার
  ৯৮৫১৮৬৭৪৯৪
- **অজিত ঘোষ**
  বাবুরহাট
  ৯৭৭৫৮৭৩১১

কুচবিহার

- **মানিক দাস**
  কুচবিহার
  ৯৪৩৪৪৮৩৭২৮
- **লক্ষ্মণ রায়**
  পুণ্ডিবাড়ি
  ৮০১৬৭৭০৮০৮
- **কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী**
  দিনহাটা
  ৯০৯৩৬৭০৬৯২
- **শ্রীধর কোঙার**
  দিনহাটা
  ৯৭৩৩১৭৯২৫৪
- **সুজিত বিশ্বাস**
  গোসানিমারী
  ৯৬১৪২৪৯৪৬২
- **বাপন পাল**
  পুষ্ণাডাঙ্গা
  ৯৮০০৭৮৯০৪৪
- **সুনীল রায়**
  তুফানগঞ্জ
  ৯৭৩৪৯২৮৩৮৬

পশ্চিম কুচবিহার

- **সমিতা ভৌমিক**
  মাথাভাঙা
  ৮৯০০৪৩২৪০৫
- **নিগমানন্দ রায়সরকার**
  সিতাইহাট
  ৯০০২৮১৬৪১৩
- **তুলসীরঞ্জন সরকার**
  মেখলিগঞ্জ
  ৯৫৩১৬২৩০৫১
- **গিরেন্দ্রনাথ বর্মন**
  শীতলকুচি
  ৯৮০০৫৩৩৯৬৫
- **শিবনাথ বিশ্বাস**
  নিশিগঞ্জ
  ৭৬৭৯৮৫২১৩১
- **গণেশ সাহা**
  চ্যাংড়াবান্ধা
  ৮৯৬৭০৪২২৬৭

ত্রিপুরা

- **ননীগোপাল দেবনাথ**
  ধর্মনগর
  ৮৯০০৪৩২৪০৫
- **কানুলাল মালাকার**
  আমবসা বাজার
  ৯৪৩৬৩৫৫৫০৭

অসম

- **রাজেশ্বর উপাধ্যায়**
  বঙ্গাইগাঁও
  ৯৪৩৫৭২০৮৬৯
- **এস এন রায়**
  ধুবড়ি
  ৯৪৩৫০২৯৫১২
- **অভয় ঘোষাল**
  গুয়াহাটি
  ৯৮৬৪০৪৮৫২৪
  ৯৮৫৪৩৮১৭৬৫

গত ৯ মার্চ ৪২ পৃষ্ঠায় স্বস্তিকার কার্যকর্তার নাম- ঠিকানায় উত্তর ২৪ পরগণা পরিবর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগণা হবে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
16 March - 2015

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা